তিন পরী ছয় প্রেমিক

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জ্যোতি প্রকাশন
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্.
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

চার টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রীতিভাজনেষু

॥ এই লেখকের অন্যান্য ॥

প্রেমের চেয়ে বড়
বারো ঘর এক উঠোন
নাগকেশরের দিনগুলি
মীরার দুপুর
নীল রাত্রি
আলোর ভুবন
সুনন্দার প্রেম
সূর্যমুখী
ইত্যাদি—

তাঁর গর্ব তিন মেয়ে।

বরং বলা ভাল তিনটি ফুল।

উনিশ, সতেরো ও পনেরো যাদের বয়েস। ধরতে গেলে তিনটিরই যৌবনের পূর্ণ জোয়ার গায়ে লেগেছে। নদীতে যেমন পূর্ণিমার জোয়ার জাগে। চোখ ফেরানো যায় না। যেমন চুল গায়ের রঙ, তেমনি ভুরু নাক চোখ চিবুক।

তেমনি হাসি। মেয়েদের হাসি কখন সুন্দর হয়? যদি সুন্দরী হয়, যদি ফুলের পাপড়ির মতন ঠোঁট হয়। অর্থাৎ হাসতে গেলেই মনে হবে একটি ফুল ফুটল। তা সেই ফুল গোলাপও হতে পারে, গন্ধরাজও হতে পারে।

প্রকাশ চাটুজ্যের তিন কন্যা যখন হাসে তখন তাই মনে হয়। তিনটি গোলাপ হাসছে। অথবা তিনটি গন্ধরাজ।

এখন গায়ে তাদের গন্ধরাজের মাতাল করা সুবাস কি গোলাপের মিষ্টি সৌরভ তা বলা মুশকিল। সেটা যাচাই করতে যাবে কে?

এই নিয়ে প্রকাশবাবু মাথা ঘামান না।

তাদের গায়ের গন্ধ তারা নিজেরাই টের পাক।

কেন না তিনজনই যে কুমারী।

যখন পাত্রস্থ করা হবে তখন গন্ধ-টন্ধ নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক জুটবে।

কাজেই প্রকাশবাবু এদিক থেকে উদাসীন অনুৎসাহী।

তিনি জন্মদাতা। তিনি পিতা। তাঁর এই নিয়ে চিন্তা করার কথা নয়।

তাঁর শুধু চোখে দেখে পরিতৃপ্ত হওয়া। সেদিক থেকে সত্যি তিনি সুখী। তিনটিই তাঁর চোখের আনন্দ, অন্তরের উল্লাস।

হুঁ, তাঁর অন্তরের উল্লাস, মনের গর্ব এবং একটা বড় রকমের অহঙ্কারও।

লাকী শাখী ও জোনাকী যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, আর বাইরে থেকে প্রাতর্ভ্রমণ কি সান্ধ্যভ্রমণ সেরে প্রকাশবাবু ঘরে ঢোকেন, তখন তাঁর মনে হয় তিনি রাজপ্রাসাদে ঢুকছেন।

টিনের বেড়া টালির ছাদ লঝ্‌ঝড় দরজা-জানালা, তাও একটা জানালার পাল্লা তো কবেই খুলে পড়েছে।

লাকী তার একটা পুরানো ছেঁড়া সায়া পাল্লা খুলে যাওয়া জানালাটায় ঝুলিয়ে রাখে।

অবশ্য যখন দরকার বোধ করে। সামনের রাস্তা দিয়ে যখন বেশি লোকজন চলা-ফেরা করে। আর ঘাড় ঘুরিয়ে প্রকাশবাবুর ঘরের দিকে সব তাকায়।

মেয়েলী লজ্জা নিয়ে একটা আব্রু তুলে ধরার স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়েই লাকী তখন তার ময়লা ছেঁড়া সায়াটা জানালায় ঝুলিয়ে দেয়।

ঐ সকালে একটু সময়, আর বিকেলের দিকে। অফিস কাছারী কারখানা বাজার করা সেরে দল বেঁধে পাড়ার বে-পাড়ার মানুষ প্রকাশবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে তখন ঘরে ফেরে কিনা!

হুঁ, একটিবার এই ভাঙা জানালার দিকে ভাঙা টালি-ছাওয়া টিনের ডেরার দিকে সবাই তাকাবে।

সকলেরই লোভ এদিকে।

প্রকাশবাবু কি আর এটা লক্ষ্য করেন না! যে জন্যে তিনি মনে মনে হাসেন। তিনি মনে করেন, হোক না বস্তির ঘর, প্রকাশবাবুর কাছে এই ঘর রাজপ্রাসাদের তুল্য।

রাজার সম্পদ তাঁর ঘরে রয়েছে।

কোঠাবাড়ির বৈভব তাঁর হাতের মুঠোয়। লাকী শাখী জোনাকী।

এই পাড়ায়, আগে এতটা ছিল না, এখন বড় বড় বিল্ডিং উঠেছে, চারধারে বড়-মানুষের ভিড়, তারা গাড়ি চড়ে বেড়ায়, তাদের ঘরে

বৌ-ঝিদের গায়ে দামী শাড়ি জামা গয়নাগাটি ঝি-চাকরের ছড়াছড়ি, নিত্য লেংড়া আম ইলিশমাছ খায়, আর শীতে ফুলকপি গল্‌দা চিংড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি কমলালেবু আনেন।

প্রকাশ চাটুজ্যের প্রায় দিন চলে না। জজ-কোর্টের কেরানী ছিলেন, এখন রিটায়ার করে পেনশনের সামান্য ক'টা টাকা দিয়ে চার-চারটে প্রাণীকে খুব কষ্টে চলতে হয়।

অবশ্য সবই বরাত।

তা না হলে প্রকাশবাবুর পুত্রভাগ্য নেই কেন? তিনটিই কন্যা-রত্ন।

স্ত্রী স্বর্গে গেছেন ক'বছর আগেই।'

লাকী শাখী অনেক সময় পাল্টাপাল্টি করে শাড়িটা ব্লাউজটা পরে, উনিশ আর সতেরো বছরের ব্যবধানটা খুব বেশি চোখে পড়ে না। শরীরের গড়ন দু বোনের প্রায় একরকম হয়ে এসেছে।

পাশাপাশি দাঁড়ালে মাথায়ও দুজন সমান এখন।

জোনাকীটা আজও বড় দু বোনের কথায় 'বাঁটকুলে' হয়ে আছে, তেমন একটা লম্বা হয়নি, শরীরটাও রোগার দিকেই—কাজেই ওর ফ্রক ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ পনেরো বছর বয়সেই শাখীকে লাকীকে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরতে হয়েছিল।

অনেকটা প্রকাশবাবুর শরীরের ধাঁচ পেয়েছে ছোটমেয়ে। খর্বাকৃতি।

ছোটর তুলনায় বড়মেয়ে লাকী ও মেজমেয়ে শাখীর শরীর অনেক বেশি উঁচু লম্বা। যেন দুটো রজনীগন্ধার ডাঁট।

প্রকাশবাবুর স্ত্রী তাই ছিলেন কিনা। ফরসা দীর্ঘাঙ্গী সুকেশী। এবং ঐ যে বলা হয়, সুদতীও। আহা, কী দাঁত ছিল লাকী শাখীর মা-র! যমুনা যখন হাসতেন, প্রকাশবাবুর মনে হত একটা পদ্ম পাপড়ি খুলল।

যখন ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরের বারান্দায় কি

রাস্তার ধারের জানালায় দাঁড়াতেন, মনে হত বুঝি কোন বনদেবী বনবালা দাঁড়িয়ে আছে।

হুঁ, বড় দুই মেয়ে মায়ের রঙ পেয়েছে চুল পেয়েছে শরীরের কাঠামো পেয়েছে। একমাত্র ছোটমেয়েই বাপের মতন রোগা হল বেঁটে হল।

কিন্তু চুল দাঁত নাক ভুরু এবং গায়ের রঙ? মোটেই প্রকাশবাবুর মতন না।

প্রকাশবাবুর মাথা জুড়ে বিশাল টাক। চুলের কোন প্রশ্নই নেই সেখানে। গাত্রত্বক আবলুশের মতন মিশমিশে কালো। নাকটাও বেশ থ্যাবড়া। দাঁত অমসৃণ এবং অসমান। এবং এককালে ভীষণ পান-দোক্তার ভক্ত ছিলেন বলে দাঁতের যা বর্ণ ধরেছে!

অবশ্য অর্ধেক দাঁতই কড়া দোক্তার কল্যাণে খসে পড়েছে।

যাই হোক, ছোটমেয়ে জোনাকী বাপের কিছুই পায়নি।

এদিক থেকে কতবড় ভাগ্যবান প্রকাশ চাটুজ্যে, যদি জোনাকীকে দুদণ্ড কেউ দাঁড়িয়ে দেখে।

একটু বেঁটে একটু রোগা।

তা না হলে নাক-চোখ? চুল? দাঁত? গায়ের রঙ?

লাকী শাখী সেখানে পৌঁছতে পারে না। যমুনা রূপসী ছিলেন। লাকী শাখীও তাই।

কিন্তু মাথায় একটু খাটো না হলে জোনাকীকে 'ডানাকাটা পরী' বলতে দোষ কোথায়?

প্রকাশবাবু মোটেই ঘাবড়ান না। বড় দুই মেয়ে জোনাকীকে 'বাঁটকুলে' বলে ঠাট্টা করলেও, প্রকাশবাবুর দৃঢ় ধারণা, ষোল-সতেরোয় পা দিলেই জোনাকীর শরীরের গিঁঠ ছাড়বে।

দেখতে দেখতে এই মেয়েও সেদিন আর একটা রজনীগন্ধার ডাঁট হবে। আরও সুন্দর শরীর হবে ওর।

তাই কী, প্রকাশবাবু মাঝে মাঝে চিন্তা করেন. এমন নিখুঁত

ফুটফুটে গায়ের রঙ, কথায় বলে 'জ্যোৎস্না-ছাঁকা রঙ'—ছোটমেয়ে এই জিনিস পেল কোথায়?

সেজন্য নাম রাখা হয়েছিল জোনাকী। অন্ধকারেও এই রঙ দীপ্তি ছড়ায়।

আর চুলের তো কোন তুলনাই হয় না। কেবল যে কুচকুচে কালো এবং কোমর-ছাড়ানো দীর্ঘ কেশ তা তো নয়, কালোর সঙ্গে কেমন একটা নীলাভ দ্যুতিও আছে, আর বেশ একটু ঢেউ-খেলানো। যেন প্রত্যেকটা চুলের গোছা তরঙ্গ হয়ে নাচতে নাচতে মাথা থেকে কোমরের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে।

হুঁ, জোনাকী যখন চুল খুলে দাঁড়ায়, প্রকাশবাবুর মনে হয় ছোট-খাট একটা কালো সমুদ্র মাথায় নিয়ে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁতগুলি তো রীতিমত জুঁইফুল। উরু পাখির ডানার মতন যুগল ভুরু।

কাজেই প্রকাশবাবু সুখী। লেংড়া আম ইলিশমাছ খান না। কুমড়ো পুঁই-শাক ডাল-ভাতের সংস্থান করতেই তাঁর কোমর বেঁকে যায়। তার ওপর দিন দিন যা দুর্মূল্য হচ্ছে বাজার।

লাকী শাখীকে পাল্টাপাল্টি করে শাড়ি-জামা পরতে হয়।

যথেষ্ট রোজগার থাকলে তবে তো গণ্ডায় গণ্ডায় শাড়ি-জামা এনে দিতে পারবেন মেয়েদের? জোনাকীরও ঐ একটাই ভাল ফ্রক, একটাই জামা।

এমনও হয় বাদলার দিনে যখন ফ্রকটা জামাটা শুকোতে চায় না, তখন প্রকাশবাবুর খদ্দরের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে থাকতে হয় বেচারাকে। দুই দিদির মতন তো আর পাল্টাপাল্টি করে পরার উপায় নেই তার। তা হলে ফ্রক পরা আর একটি বোন থাকার দরকার ছিল ঘরে।

রক্ষে করো! জোনাকী তখন মনে মনে বলে, আমাদের তিন

বোনকে নিয়েই বাবা হিমসিম খাচ্ছে—আবার যদি একটা বোন থাকত তবেই হয়েছিল আর কি ! তার চেয়ে বাবার মোটা চাদরটা কিছুক্ষণ জড়িয়ে থাকা ঢের ভাল।

একটা ক্রিমের কৌটো থেকে কৃপণের মতন আঙুলের মাথায় একটু একটু নিয়ে তিন বোন মুখে মাখে, একশিশি মাথার তেল যত্ন করে দীর্ঘদিন লাগিয়ে তিনজনকে চুলে মাখতে হয়। একটা সাবান ভাগাভাগি করে গায়ে মেখে তিন বোন স্নান করে।

উপায় কি ?

গরীব মানুষ প্রকাশ চাটুজ্যে। কিছুই প্রায় তিনি মেয়েদের এনে দিতে পারেন না। অথচ চারদিকে তাকাও, পোশাক আসাক প্রসাধনের বন্যা বয়ে চলেছে।

তবু প্রকাশবাবুর মনে একটা সাংঘাতিক গর্ব, তাঁর তিন কন্যার মতন সুন্দরী এই পাড়ায় আর একটি নেই। এবং অন্য আর পাঁচটা পাড়ায় আছে কিনা প্রকাশ চাটুজ্যের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কাজেই দারিদ্র্যের জন্য তিনি সঙ্কুচিত নন, ভাঙা ঘরে থাকেন বলে একটুও দুঃখ নেই মনে। শাক-ভাত ডাল-ভাত খান বলে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন না।

এই ভাঙা বস্তির ঘরে যে সাত রাজার ধন আছে, এটা কেবল তিনি কেন পাড়ার সবাই জানে। ভিন্ন পাড়ার মানুষও জানে।

সে কারণে নিমতলার প্রকাশ চাটুজ্যের টালির ঘরের জানালার দিকে সকলের এত লোভ, এত মনোযোগী দৃষ্টি।

বাবুরা গাড়ি চড়ে বেরোন। পুরনো নিমগাছটার নিচে দিয়ে যখন গাড়িটা ছুটতে থাকে তখন তাঁদের ঘাড়টা প্রকাশবাবুর ঘরের দিকে ঘুরবেই। স্কুল-কলেজে যায় ছোঁড়ারা, দুবার তিনবার করে লাকী শাথীদের জানালাটার দিকে তাকাবেই। বড়লোকের ছেলে সব। দুধ ক্ষীর ননী খাওয়া শরীর। চমৎকার জামা-জুতো।

এমন কি জমকালো শাড়ি-গয়না পরা বড়লোকের গিন্নীরাও।

মার্কেটিং করতে বেরোন কি সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যান বা দেখে ঘরে ফেরেন—তাঁদেরও উৎসুক দৃষ্টি বস্তির এই ঘরটার দিকে।

এসব দেখে লাকী শাখী এবং জোনাকীর মনেও কি কম গর্ব ?

তারা বুঝে গেছে মুখে গাদা গাদা স্নো ক্রিম পাউডার মাখার দরকার নেই—তাদের গায়ের রঙ, শরীর ও মুখের লাবণ্য ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী—সবাইকে চমকে দেবার মতন।

দামী শাড়ি-জামা না পরলেও মানুষ তাদের দিকে তাকাবে।

একবারের জায়গায় তিনবার তিন বোনকে দেখেও তাদের আশা মেটে না।

এই নিয়ে তিন বোন হাসাহাসি কম করে না। বিশেষ করে ঘরে বৌ আছে, তিন-চারটি ছেলেমেয়ের বাপ, তবু লাকী শাখী জোনাকীর দিকে তাকিয়ে এক একটি পুরুষ যখন বড় বড় নিশ্বাস ফেলে।

কেবল কি তারা ? মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে দাঁত পড়তে শুরু করেছে এমন সব বুড়োও লাকী শাখীদের জানালাটার দিকে তাকাবে।

তাই তো, নিমতলার ওই টালির ঘরটার ভিতর মধুর চাক রয়েছে !

দেখে প্রকাশ চাটুজ্যেও মনে মনে হাসেন।

ঘরে মা নেই। ঝি-চাকর রাখার মতন অবস্থা আগেও ছিল না প্রকাশবাবুর।

হুঁ, যেদিন চাকরি করতেন। এখন তো তেমন একটা কথাই উঠতে পারে না। পেনশনের পৌনে দুশো টাকায় যার সংসার চলছে।

মেয়েরাই ভাগাভাগি করে ঘরের কাজকর্ম করে।

শাখীর রান্নার হাত চমৎকার। প্রকাশবাবু মেজমেয়ের হাতের

রান্না খেয়ে তৃপ্তি পান। শাখী যখন রান্না নিয়ে থাকে, জোনাকী তখন জল তোলে, ঘর মোছে, বাটনা বাটে, বাসন-কোসন ধোয়।

তখন লাকী ঘর ঝাঁট দেয়, এটা-ওটা গুছোয়, বাবার বিছানা-বালিশ ঠিক করে রাখে, কাঁথা-মাতুর রোদে দেয়।

হাতে হাতে কাজ করলে কতক্ষণ লাগে! নিজেদের নিয়েই তো সংসার। বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা নেই। তবে মাঝে মাঝে বড়মেয়ে লাকীও রান্না নিয়ে বসে। উঁহু, ভাত নয়। পিঠে-পায়েস বা আর কিছু খাবার-টাবার যেদিন করতে হয়। এবং সেটা কখন? পিঠে-পায়েস কি কিছু জলখাবার হুটহাট ঘরে তৈরি করার মালমশলা যোগাড় করা প্রকাশবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। এই রোজগারে তা হয় না।

সে-সব হয় আর একটা মানুষের কল্যাণে। নতুনবাজারে তাদের গুড়ের কারবার। সুখেনদের। পুরো নাম সুখেন্দু পাল। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস।

সুখেন তো যখন-তখন এ-বাড়ি আসছে। লাকীর কাছে আসছে। মাঝে মাঝে পাটালি গুড় নিয়ে আসে। শীতের সময়ই বেশি। তা শুধু গুড় আনলে তো হয় না। দুধ কলা নারকেল—গুড়ের সঙ্গে সবই আনে সুখেন।

লাকী পিঠে তৈরি করে, পায়েস রান্না করে। যেন সুখেনের জন্যই সব করা হয়। তা একজনের আয়োজন তো নয়, বুদ্ধি করে একটু বেশি করে সব জিনিসই আনে সুখেন।

তাই আমোদ করে রেঁধে-বেড়ে সুখেনকে পিঠে-পায়েস খাইয়ে বিদেয় করে দিয়ে লাকী দু বোনকে আদর করে ডেকে খাওয়ায়, বাবাকে খাওয়ায়, নিজে খায়।

প্রকাশবাবু ভিতরে ভিতরে খুশি। কারবারী মানুষের ছেলে সুখেন। লাকীর সঙ্গে ছোঁড়ার জানাজানি আছে বলে তিনি মোটেই অসন্তুষ্ট নন।

সুখেন যেমন মাঝে মাঝে গুড় দুধ নারকেল নিয়ে আসে, তেমনি বংশী আসে কলা নিয়ে পেয়ারা নিয়ে, কখনও আতা আনে, কখনও দুটো বেল। সব বংশীদের বাগানের ফল।

বেহালায় তাদের প্রকাণ্ড বাগান।

বংশীদের বাগানের কুল পেয়ারা শাখী খাবে বলে ছোঁড়া প্রায়ই থলের মধ্যে ঢুকিয়ে কি কাগজের ঠোঙায় ভরে এ-বাড়ি ছুটে আসে।

একলা কিছু শাখী সব খায় না। খেয়ে শেষ করতে পারে না। লাকীকে ভাগ দেয়, জোনাকীকে দেয়, মিষ্টি কুল হলে দুটো একটা প্রকাশবাবুও গালে ফেলেন বৈকি।

তবে বেল পেলে তিনি দারুণ খুশি। যেদিন বংশী বেল নিয়ে আসে সেদিন প্রকাশবাবুর আহ্লাদ দেখে কে! কেন না আজ যদি বেল খান কাল সকালে আর পায়খানার জন্য তাঁর ভাবতে হবে না -- এই চিন্তাটাই তাঁকে সুখ দেয় বেশি।

এবং সেদিন তিনি খুশির চোটে বংশীকে কাছে ডেকে দু-একটা ভাল-মন্দ কথা পর্যন্ত বলেন।

একহারা ছিমছাম গড়ন ছোকরার। একুশ-বাইশ বছর বয়স হয়েছে। মেজমেয়ে শাখীর সঙ্গে কবে কোথায় পরিচয় হয়েছিল তার, এই নিয়ে প্রকাশবাবু মোটেই মাথা ঘামান না।

জল জলের দিকে ছুটবেই, ভোমরা ফুলের কাছে আসবেই। বাতাসের ছোঁয়া পেলে, আগুন লকলক শিখা তুলে নাচবে জানা কথা। প্রকৃতির নিয়ম রুখবে কে?

একটি ছেলে একটি মেয়ের কাছে আসবে এই নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা প্রকাশবাবুর পোষায় না।

যেমন সুখেনকে নিয়েও তিনি কোনদিন কোন দুর্ভাবনার আমল দেননি।

বংশী ট্যাক্সি চালায়। তাতে কি? কথাবার্তায় চালাক-চতুর এবং চালচলনেও বেশ মার্জিত ভদ্র।

লাকীর কাছে সুখেন আসে; শাখীর কাছে বংশী আসে, জোনাকীর কাছেও ক'দিন ধরে একটি ভ্রমর আনাগোনা শুরু করেছে।

দর্জির দোকানের পরেশ। সবে গোঁফ উঠতে আরম্ভ করেছে। সতেরো-আঠারো বয়েস। পরনে শার্ট-পায়জামা। হাসিটি অদ্ভুত মিষ্টি। কথা কম বলে। হাতে একটা ঘড়ি আছে।

হুঁ, সুখেন লাকীর জন্য পাটালি গুড় নারকেল সুগন্ধী চাউল নিয়ে আসে, বংশী শাখীর জন্য কুল পেয়ারা আতা নিয়ে আসে, পরেশও কিন্তু খালিহাতে জোনাকীর কাছে আসে না। দু এক গজ ছিট কাপড়ের টুকরো কাগজে মুড়ে জোনাকীর জন্য নিয়ে আসে। দর্জির দোকান। রাতদিন এটা-ওটা তৈরি করতে কতরকম ছিট কাটা হচ্ছে। বাড়তি দু-এক টুকরো কাপড় মাঝে মাঝে থেকেও যায়। পরেশ সেগুলি এনে জোনাকীর হাতে তুলে দেয়।

জোনাকী দুটো হাত-কাটা ব্লাউজ তৈরি করেছে। তার ফ্রকের সঙ্গে দুটোই খুব মানিয়েছে। সেদিন একটা ছিটের টুকরো এনেছিল পরেশ। জোনাকী সেটা বড়দিকে দিয়ে দেয়। কাল আর একটা এনেছে। সেটা মেজদিকে দিয়েছে। জোনাকীর কল্যাণে লাকী শাখীরও নতুন ব্লাউজ হয়ে গেল। এটা কম কথা কি!

যেখানে সারা বছরে মেয়েদের একখানার বেশি দুখানা জামা কিনে দেবার ক্ষমতা নেই প্রকাশবাবুর।

দর্জির দোকানের এই ছেলেটিকে ভারি স্নেহের চোখে তিনি দেখতে আরম্ভ করেছেন।

কবে কোথায় জোনাকীর সঙ্গে পরেশের আলাপ-পরিচয় হয়, যার সূত্র ধরে পরেশ এ বাড়ি আসতে আরম্ভ করেছে, প্রকাশবাবু খুঁটিয়ে সে-সব কাউকে জিজ্ঞেস করা বাহুল্য মনে করেন।

ফুল ফুটলেই অলি জুটবে। প্রকৃতির নিয়মকে তুমি বাধা দেবে কেমন করে? পনেরোয় পা দিয়েছে জোনাকী। দেহে-মনে বসন্তের

হাওয়া লেগেছে। তার ওপর এমন ফুটফুটে চেহারা। এমন রঙ এমন চুল মেয়ের।

একটি কেন, পরেশের বয়সের ডজন দুই ছোঁড়া যদি জোনাকীর আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতে আরম্ভ করত, তাতেও অবাক হবার কিছুই থাকত না।

প্রকাশ চাটুজ্যে অবাক হননি। যেমন বড় দুই মেয়ের বেলায়ও সুখেনের ও বংশীর ঘন ঘন এ-বাড়ি আসা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্ময় বোধ করছেন না।

সুখেনের বয়সের কি বংশীর বয়সের অন্তত পঁচিশটা ছেলে যদি এ-বাড়ি হাঁটাহাঁটি করতে শুরু কবত, তাঁর করার কিছুই ছিল না।

কিন্তু কত ভাগ্য তাঁর। লাকী শাখী বা জোনাকী সেই চরিত্রের মেয়ে নয় যে, পুরুষ দেখলেই হাতছানি দেবে আর ঝাঁকের ঝাঁক সব নিমতলার এই ভাঙা টালি-ছাওয়া ঘরে উড়ে আসবে।

সেই ক্ষমতা তাদের ছিল।

হয়তো হাতছানি দিতে হত না।

একটু তাকানো কি একটুখানি হাসিই যথেষ্ট।

যেখানে এ-পাড়ার, কেবল এ-পাড়া কেন, আশে-পাশের অনেক পাড়ার ষাট বছরের বুড়ো থেকে আরম্ভ করে চৌদ্দ বছরের এক একটা চ্যাংড়া পর্যন্ত নিমতলার এই রাস্তা ধরে চলতে ফিরতে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে প্রকাশ চাটুজ্যের ঘরটার দিকে তাকায়।

তারা জেনে গেছে, তারা দেখেও ফেলেছে শাক-ভাত খেয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, ছেঁড়া চটি পরেও প্রকাশবাবু রাজেশ্বর। কোটিপতি। তাঁর কপালটা ভাল। স্যাঁতসেঁতে ঘরে সাত রাজার ধন। তিনটি মুক্তা অহর্নিশি ঝলমল করছে সেখানে।

হুঁ, জানালায় দেখেছে, বারান্দায় দেখেছে, বারান্দার বাইরে বাড়িতে ঢোকার সরু রাস্তাটায় তিন বোনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সবাই। রোজই দেখে।

লাকী শাখী জোনাকী।

চমৎকার নাম। তিনটি ফুল দেখে পাড়ার বে-পাড়ার ছেলে-বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তাই বলা হচ্ছিল। ধুলো উড়িয়ে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে এক একটা গাড়ি প্রকাশবাবুর গা ঘেঁষে ছুটে চলে। প্রকাশবাবু গ্রাহ্য করেন না।

দামী জামা-জুতো পরে ছড়ি ঘুরিয়ে বড় বড় বাবুরা সকালে বিকালে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরোন। তাঁদের পাশ দিয়ে মলিন বেশবাস নিয়ে প্রকাশবাবুও বুক ফুলিয়ে হাঁটেন।

তিনি যে কারো চেয়ে কম নন! তোমাদের গাড়ি বাড়ি মোটা মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, কিন্তু আমার যা আছে তোমাদের তা নেই। প্রকাশবাবুর এক একদিন ভুঁড়িমোটা বাবুদের ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—হুঁ, তোমাদের অনেকের ঘরেই কন্যা আছে, কিন্তু রাজকন্যা নেই, ডানাকাটা পরী নেই।

তোমাদের ছেলেরা ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার প্রফেসার হচ্ছে, কেউ বিলেত যাচ্ছে, কেউ বিলেত থেকে ঘুরে আসছে, বড় চাকরি করছে কেউ। ঘরে সুন্দরী বৌ এনেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ, তাদের কারো মনে শান্তি নেই। ঘুঁটের আগুনের মতন সব ধিকিধিকি জ্বলছে। কারো মনে শান্তি নেই, কারণ তারা কেউ লাকী শাখীর মতন নারীকে বিয়ে করতে পারল না।

ভুঁড়িমোটা বাবুদের গিন্নীরাও ঈর্ষায় ছটফট করছে। নিমতলার ওই টালির ঘরটা তাদের চক্ষুশূল। দামী শাড়ি-গয়না পরলে হবে কি, ইলিশমাছ লেংড়া আম রাজভোগ ছানার পোলাও খেলে হবে কি, কর্তারা তাদের খুবই সুখে রেখেছেন, ব্যাগ-ভর্তি করে টাকা নিয়ে রোজ মার্কেটিং করতে বেরোয়, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যায়—

হুঁ, সুখের শেষ নেই—কিন্তু, কিন্তু সুখী গিন্নীরা কি দেখছে না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে কি যখন রাস্তায় বেরোয়, বাবুরা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে কেবল প্রকাশ চাটুজ্যের ঘরটাই দেখছে—কর্তাদের মন লাকী শাখী এমন কি জোনাকীর দিকেও। ঘরে আম মাছ রাজভোগ শাড়ি-গয়নার ঢালাও ব্যবস্থা করে দিলে হবে কি ? টের পেয়ে গিন্নীদের চিত্তজ্বালার শেষ নেই।

সব দেখেশুনে টের পেয়ে প্রকাশ চাটুজ্যের বুকটা অহঙ্কারে ফুলতে থাকে। বোঝা যায় তিনি এই তল্লাটের সবচেয়ে সুখী ঈর্ষণীয় ব্যক্তি। যে জন্যে তাঁর আত্মপ্রসাদের শেষ নেই।

তাঁর মেয়েরা মেমসাহেবদের স্কুলে লেখাপড়া শেখে নি। মেম-সাহেবের স্কুল কেন সাধারণ স্কুলেও তাদের লেখাপড়া শিখতে পাঠাতে পারেন নি প্রকাশবাবু। অবস্থায় কুলোয় নি।

পাড়ায় বুধু পণ্ডিতের পাঠশালায় দু-চারদিন করে তিন মেয়েই গিয়েছিল। ঐ বানান করে বই-টইটা পড়তে পারে এবং দু-এক ছত্র চিঠি লেখার মতন হাতের লেখাও রপ্ত করেছে। ব্যস, আর দরকার নেই। প্রকাশবাবু মনে করেন এইটুকুন বিদ্যাই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট। তারা যে এমনিতে বিদ্যাধরী। বি-এ, এম-এ পাস করার দরকার পড়ে না।

হুঁ, পরেশ বংশী সুখেন। প্রকাশবাবুর অন্তঃপুরে ঢোকবার ছাড়পত্র যে তিনটি যুবক পেল। না, তারাও খুব একটা লেখাপড়া-জানা ছেলে নয়। ফোর ফাইভ সিক্স ক্লাস পর্যন্ত এক একটির বিদ্যা। এইজন্য প্রকাশবাবুর মনে কোন খুঁতখুঁতি নেই।

এই শহরে সারা জীবন কাটল তাঁর। লেখাপড়া-জানা সোনার মেডেল পাওয়া চমৎকার রত্নই বা কত দেখেছেন! ঘোড়ার ঘাস কাটছে। তার সঙ্গে বসে কোর্টে কলম পিষেছে ক'জন! উপোস ক-রা মাইনে পেয়ে এই স্কুল সেই স্কুলে ছেলে ঠেঙাচ্ছে গণ্ডায় গণ্ডায়।

লেখাপড়ার ওপর আর আস্থা নেই প্রকাশবাবুর।

তার চেয়ে বাপের গুড়ের কারবার দেখছে সুখেন অনেক ভাল।

ট্যাক্সি চালাচ্ছে বংশী তাও ভাল।

দর্জির দোকানে মাথা গুঁজে সেলাইকল চালিয়ে জামা প্যান্ট সেলাই করছে পরেশ। বুদ্ধিমানের কাজ করছে ছোঁড়া। পরে নিজে দোকান দেবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া এই দিনে কিছু আছে নাকি?

ভুঁড়িমোটা বাবুর দল তো কালোবাজারী পয়সায় ঘুষের পয়সায় উঁচু উঁচু বাড়ি হাঁকিয়েছেন, গাড়ি কিনেছেন। প্রকাশ চাটুজ্যে খুব টের পান। চাকরি করে এসব করতে গেলে এক এক চাঁদের ইয়ে ফেটে যেত না!

কাজেই লেখাপড়া-জানা ছেলে নয় বলে পরেশ সুখেন কি বংশীর ওপর তাঁর নিজের দিক থেকে একটুও অসন্তোষের কারণ নেই।

দোতলা তেতলা বাড়ির লেখাপড়া-জানা ছেলের দল তীর্থের কাকের মতন নিমতলার এই ঘরটার দিকে চেয়ে থাকে দেখে প্রকাশ-বাবু বেশ মজা পান। কিন্তু চেয়ে থাকলে কি হবে, বেল পাকলে কাকের আশা নেই, প্রকাশবাবু নিজের মনে বিড় বিড় করেন।

॥ দুই ॥

এতক্ষণ প্রকাশবাবুর দিক থেকে কথাগুলো বলা হল। প্রকাশ-বাবুর চোখ দিয়ে আমরা তাঁর ডানাকাটা পরীর মতন তিন কন্যাকে এবং কন্যাদের মনোরঞ্জনের জন্য পাটালি গুড় দুধ নারকেল কুল পেয়ারা ও ছিটের টুকরো ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিস নিয়ে আসা তিন প্রেমিক অর্থাৎ সুখেন বংশী ও পরেশকে দেখলাম।

এবার ডানাকাটা পরীদের চোখ দিয়ে প্রকাশবাবুর সংসারটা দেখা যাক।

আজ দুদিন সুখেন আসছে না। সে জন্য লাকীর মন ভীষণ খারাপ।

কেন আসছে না সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

সিনেমা দেখার নাম করে দুপুরের দিকে একবার নতুনবাজারে ওদের গুড়ের আড়তে গিয়ে খোঁজ করবে কিনা লাকী চিন্তা করছিল। ঘর-দোর গোছাতে গিয়ে তার হাত সরছিল না।

অথচ পাশের ছোট ঘরটায় প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ধরে ফিসফিস গুজগুজ চলছে। ওই ঘর লাকী শাখী দুজনের জন্যই। এই ঘর, এখন যেটা গুছোতে এসেছে, সেটা প্রকাশবাবুর শোবার কামরা। ঘর বলতে তো একটাই। মাঝখানে দরমার বেড়া তুলে দিয়ে পার্টিশানের মতন করে ভিতরটাকে দুভাগ করা হয়েছে এই যা।

হুঁ, দুটো কামরা। এই কামরায় প্রকাশবাবু ও ছোটমেয়ে জোনাকী শোয়।

পাশের কামরায় লাকী শাখী দুই বোন শোয়।

এখন পাশের কামরায় শাখী আর তার প্রণয়ী বংশী বসে কথা

বলছে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের ফিসফিস গুজগুজ চলছে। মাঝে মাঝে চাপা হাসি কানে আসছে।

অবশ্য যখন সুযোগ আসে তখন লাকী সুখেনকে নিয়ে এই কামরায় বসে গল্প-সল্প করে।

এখন যেমন লাকী বা জোনাকী ওই ঘরে যাবে না, তেমনি সুখেনকে নিয়ে লাকী যখন কথা বলবে, তখন ভুল করেও শাখী কি জোনাকী ওই কামরায় ঢুকবে না।

আবার যখন পরেশ আসে, তখন কিন্তু—না, দিদিদের ঘরে পরেশকে নিয়ে জোনাকী বসে না। তার ভাল লাগে না। তখন সে কাঠ-কয়লা ঘুঁটে রাখার ছোট খুপরিটার মধ্যে পরেশকে নিয়ে গল্প-টল্প করতে ভালবাসে। অবশ্য জায়গাটা খুবই অন্ধকার, ঘুঁটের ময়লা কয়লার কালি তো রয়েছেই, মাকড়সার জাল টিকটিকি আরশোলাও প্রচুর চোখে পড়ে।

কিন্তু তবু জোনাকীর এই খুপরিই পছন্দ। হুঁ, যখন পরেশ আসে। পরেশের সঙ্গে বসে যখন সে প্রাণ খুলে কথা বলে। তার মনে হয় কাঠ-কয়লা রাখার জায়গাটাই স্বর্গের নন্দন-কাননেব মতন সুন্দর পবিত্র।

সুখেন বংশী বা পরেশ যখন বাড়িতে ঢোকে তখন ইচ্ছে করেই প্রকাশবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। গিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়েন। যদি ওরা কেউ সকালে কি সন্ধ্যের দিকে আসে তখন তো আর হাঙ্গামাই থাকে না। প্রকাশবাবু তখন ভুঁড়িমোটা বাবুদের গ্রাহ্য না করে নিজের মনে পার্কে কি ওদিকের ছোট মাঠটায় কি সোজা রাস্তা ধরে হাঁটেন—বেড়ান।

লাকীদের শোবার ঘরে বংশীকে নিয়ে গুজগুজ হাসাহাসি করছিল শাখী। লাকী ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল। আজ এতক্ষণ ধরে ওরা কি কথা বলছে? খুব খারাপ লাগছিল লাকীর। সুখেনের সঙ্গে এত সময় ধরে সে কথা বলেছে কোনদিন?

ওদিকে জোনাকী রান্নাঘরে বসে বাকি রান্নাটা শেষ করছিল।

কেননা বংশী আসার সঙ্গে সঙ্গে শাখী অর্ধেক রান্না ফেলে উঠে যায়।

লাকীর মতন জোনাকী কিন্তু তেমন অস্বস্তি বোধ করছিল না। কেননা পরেশ কাল সন্ধ্যের দিকে এসেছিল। অনেকক্ষণ কাঠ-কয়লার খুপরিতে বসে দুজনে গল্প করেছিল। পরেশ আজ আবার আসবে বলে গেছে।

বাকি রান্না নামাতে নামাতে জোনাকী যেন বুঁদ হয়ে থেকে পরেশের কথাই ভাবছিল। অন্য কোন চিন্তা তার মাথায় ছিল না।

লাকী ঝাড়নটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে একসময় চুপি চুপি দরমার বেড়াটার কাছে সরে গিয়ে একটা ফুটোর ওপর বাঁ-চোখটা চেপে ধরল। কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। দুজনেই এদিকে অর্থাৎ ফুটোটার দিকে পিঠ করে বসেছে। কাজেই লাকী তাদের একজনেরও মুখ দেখতে পেল না। কেবল চাপা হাসি ও ফিসফিস শব্দ দু-একবার শুনল। হাসির ধমকে দুজনের শরীর নড়ছে—তা-ও লাকী দেখতে পেল। বংশী কি শাখীর হাত ধরে আছে, না কি শাখীর উরুর ওপর ছোঁড়া ডান হাতটা রেখেছে, লাকী ঠিক বুঝতে পারল না। লাকীর কান গরম হয়ে উঠছিল। না, কিছুই দেখা গেল না। হতাশ হয়ে এক সময় বেড়ার কাছ থেকে সরে এসে আবার ঝাড়নটা তুলে নিল।

তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

সুখেন আজ দুদিন আসছে না কেন? দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে লাকী ঠিক করেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে। আজ সুখেনের সঙ্গে তার শেষ পরামর্শ। হুঁ, কী সে ঠিক করেছে মনে মনে! শেষ কথা না জানা পর্যন্ত আজ লাকী ঘরে ফিরবে না। যত রাত হোক।

'এই জোনাকী!'

জোনাকী চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। মেজদির মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে আছে। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে টিপে টিপে হাসছে।

'কি বলছিস ?' জোনাকী ডালের কড়াইটা নামিয়ে রেখে ভুরু কোঁচকাল। -

'আর এক কাপ চা করে দিবি ?'

'আবার চা !' জোনাকীর কোঁচকানো ভুরু কপালে উঠল। 'দুবার তো এর মধ্যে হয়ে গেছে !'

'একটুখানি করবি—নিজের মুখে চাইছে, না বলি কেমন করে ?' অনুনয়ের চেহারা করল শাখী।

'এত চা খেলে তোমার বংশীর গ্যাসট্রিক আলসার হবে বলে দিও।'

'বললে কি শোনে, পুরুষের গোঁ, বুঝলি না ? চট করে একটু করে দে বোন, আমি এখুনি আসছি।' শাখী আর চৌকাঠে দাঁড়ায় না। আর এক টিপ হেসে বিজলীর মতন সরে পড়ে।

জোনাকী উনুনে কেটলি চড়ায়। বেজায় ফূর্তি মেজদির আজ। মনে মনে বলল জোনাকী, ব্যাপারখানা কি ? মুখখানাও বেশ লাল টুকটুক করছে শাখীর। নিশ্চয় খুব চুমু-টুমু খেয়েছে বংশী।

ভাবতে ভাবতে জোনাকী তখনি আবার নিজের জগতে ফিরে যায়। পরেশ আজ বিকেলে যখন আসবে কালকের সেই কথাটা তুলবে সে। কথাটা কিন্তু মাঝখানে এসে থেমে আছে। হুঁ, দুদিন ধরেই কথাটা হচ্ছে। অবশ্য এই মুহূর্তে ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাক, জোনাকী বুঝি তাও চাইছে না।

যেন যত বেশি এই নিয়ে আলোচনা করা যাক ভাল লাগবে। যেন এটা একটা অন্যরকম ফল। যত কচলানো যায় তত মিষ্টি লাগবে। লেবু নয়। লেবু কচলালে তেতো হয়ে যায়।

কিন্তু এমন কি ফল আছে যে, যত তুমি কচলাবে তত সেটা রসাল হবে, মিষ্টি হবে ?

জোনাকী উনুনের সামনের কালি-ঝুল মাখা বেড়াটার দিকে চোখ রেখে ভাবতে লাগল।

'কি হল, বাড়িটা বড় বেশি চুপচাপ?'

'জোনাকী রান্নাঘরে, লাকী বুঝি বাবার ঘর গুছোচ্ছে। বাবা কাগজ পড়তে বেরিয়েছে।'

'বোসো!' বংশী আঙুল দিয়ে পাশের মোড়াটা দেখাল।

'দাঁড়াও বাপু, একেবারে চা-টা নিয়ে আসি। বোধ করি হয়ে গেছে।'

শাখী তক্ষুণি আবার চা আনতে ছুটল।

বংশী একটু মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে শাখাদের ছোট টেবিলটা দেখতে লাগল। তার মানে লাকারও টেবিল এটা। হুঁ, দু বোনই এ-ঘরে শোয়, সে শুনেছে।

ওই চুলের কাঁটাগুলো নিশ্চয় তা হলে লাকার। বংশী চিন্তা করল। কেননা এই মাত্র সে দেখেছে শাখীর শুকনো বেণীতে দুটো কাঁটাই গোঁজা আছে।

লাকীর চুলের কাঁটা দুটো দেখতে দেখতে বংশী, শাখীর সঙ্গে যে কথাটা হচ্ছিল, সেটাই নিজের মতন করে এখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। যেন কথাটা একটা লাল টুকটুকে মার্বেল। ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে বংশীর হাতে তুলে দিয়ে শাখী বলেছে, 'দ্যাখো তো জিনিসটা কেমন, পছন্দ হয় কিনা তোমার!'

হুঁ, সেই লাল টুকটুকে মার্বেলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বংশী পরীক্ষা করছে আর ভাবছে। পছন্দ হয়েছে কি হয়নি এক্ষুণি অবশ্য জবাব চাইছে না শাখী। বলছে, কি, ভেবে দ্যাখো, দুদিন ভাবো। তারপর আমাকে বলবে।

বংশী যত জিনিসটা দেখছিল তত মজা পাচ্ছিল। কেননা এটা

শাখীর ব্লাউজের ভিতর বুকের কাছে ছিল। তার মানে শাখার বুকের কথা। যেন শাখীর বুকের গন্ধ লেগে আছে টুকটুকে মার্বেলটার গায়ে। তাই ভীষণ একটা কৌতূহল নিয়ে বংশী একসময় মার্বেলটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতে আরম্ভ করল। কিন্তু বেশিক্ষণ শোঁকা হল না।

চা নিয়ে শাখী ফিরে এল।

'কি হল, দেখলে ?'

'হুঁ।' শাখীর হাত থেকে কাপটা তুলে নিয়ে বংশী ঘাড় বাঁকাল। 'দারুণ জিনিস!'

'পছন্দ হচ্ছে ?'

একগাদা খুশি চোখে নিয়ে শাখী আবার পাশের ছেঁড়া বেতের মোড়াটায় বসল। বংশীকে একটা ছোট জলচৌকির ওপর বসতে দেওয়া হয়েছে। ঘরে একটা চেয়ার-টেয়ার নেই যে, বংশীকে বসতে দেবে। অবশ্য সুখেন এলেও লাকী এই জলচৌকিটাই টেনে দেয়। লাকী ছেঁড়া বেতের মোড়ায় বসে সুখেনের সঙ্গে কথা বলে।

'তা হলে ঠিক করে ফেল কী করবে ?' শাখী চোখ আড় করে বংশীর মুখটা দেখছিল।

বংশী কাপে চুমুক দিয়ে চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলল।

'হাসছ যে ?' মিনমিনে গলায় শাখী প্রশ্ন করল। ভুরু কোঁচকাল।

'এইবারের চা-টা দারুণ হয়েছে।'

'জোনাকী কিন্তু বিরক্ত হচ্ছিল বার বার চা তৈরি করে দিতে।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ, বলছে কি, এত চা খেলে তোমার গ্যাসট্রিক আলসার হবে।'

'হোক। ভাল জিনিস খেয়ে অসুখে ভোগাও ভাল।' বংশী চাপা গলায় হাসল। 'তোমার ছোট বোনকে বলবে।'

'বলব।' চট করে একটু গম্ভীর হয়ে গেল শাখী। আঙুল দিয়ে মাথার পিছনটা একটু চুলকাল। তারপর চট করে চুলের কাঁটা

ছুটো টেনে খুলে ফেলল। শুকনো বেণীটা সাপের মত প্যাঁচ খুলে গিয়ে পিঠের ওপর ঝুলে পড়ল। হাতের কাঁটা ছুটো শাখী টেবিলে রাখল—লাকীর কাঁটা ছুটো থেকে একটু সরিয়ে। যেন লাকীর চুলের কাঁটার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হোক শাখী চাইছিল না।

'কালকের মধ্যে কিন্তু যা করার ঠিক করে ফেলবে।'

দেরি না করে বংশী ঘাড় বেঁকাল। তারপর হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল।

'কিন্তু আমায় ছুদিন সময় দেবে বললে যে?' বংশী ফিসফিসিয়ে উঠল।

'হুঁ, তা দিচ্ছি।' শাখী ঠোঁট না ছড়িয়ে হাসল। 'তবে তুমি আজ থেকেই ভাবতে আরম্ভ কর—কালকের মধ্যে মনে মনে যা করার ঠিক করে ফেলবে। পরশু কিন্তু পাকা কথা চাই।'

বংশী একটা সিগারেট ধরাল।

বংশীকে বিদায় করে দিয়ে শাখী যখন বড় ঘরে ঢুকল, লাকীর তখন ঝাড়পোঁছ শেষ হয়েছে।

'অনেকক্ষণ যেন আজ ছুজনে কথা বললে?' লাকী মেজবোনের মুখটা দেখল।

শাখী অল্প হাসল।

'খুব বেশিক্ষণ হয়েছে কি?'

'বা-স-রে, সেই কখন বেলা ন'টায় বাড়িতে ঢুকল ছোঁড়া—এখন এগারোটা বাজে—পাক্কা ছুঘণ্টা বসে ছুজনে ফিসফিস গুজগুজ করলি।'

'ছুঘণ্টা হবে কেন—আড়াই ঘণ্টা।' বলতে বলতে জোনাকী এ-ঘরে ঢুকল। 'কলে জল এসে গেছে। সাড়ে এগারোটায় জল আসে।'

লাকী শাখী ঘাড় ঘুরিয়ে জোনাকীকে দেখল। আগুনের তাপে ফরসা মুখটা ভীষণ লাল হয়ে গেছে।

শাখী চুপ করে রইল। লাকী এবার জোনাকীর দিকে চোখ রেখে বলল, 'তুই আগে চান করতে যাবি ?'

'আমার দেরি হবে।' জোনাকী একটা ক্লান্তির হাই তুলল।

'শাখী, তা হলে তুই চানটা সেরে আয়।'

'আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

শাখীর হু চোখে তখনও হাসির ছটা লেগে আছে। লাকী শব্দ করল না। মাথা গুঁজে বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হুজনেই স্নুখের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। শাখী জোনাকী। ভাবতে ভাবতে লাকী নিজেদের ছোট ঘরে ঢুকে শাড়ি সায়া ও সাবানের টুকরোটা নিয়ে কলতলায় চলল। ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি বসানো জলচৌকিটা ও ছেঁড়া বেতের মোড়াটা দেখল। দেখে তার বুকের আগুন নতুন করে দাউ দাউ করে উঠল। পুরো হুটে দিন স্নুখেনের দেখা নেই। এমন তো হয় না! তবে কি···

লাকী ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিল না! হঠাৎ স্নুখেনের মতি-গতি পাল্টে যাবে? সেই ছেলে তো সে নয়! তোমার জন্যে আমি বিষ খেতে পারি, ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিতে পারি, কতদিন কত কথাই তো বলেছে স্নুখেন!

হুপুরে তিন বোন একসঙ্গেই খেতে বসল। প্রকাশবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন।

খেতে বসে লাকী একটা কথাও বলল না। শাখী ও জোনাকী হু-চারটে কথা বলল। অন্যদিন খেতে বসে তিন বোনই রীতিমত কলরব করে থাকে। আজ লাকী অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে দেখে শাখী জোনাকী বেশি সাড়াশব্দ করল না।

খেয়ে উঠে লাকী কাপড় পরতে লাগল।

'কোথায় যাবি?' জোনাকী জিজ্ঞেস করল।

'একটু দরকার আছে।' লাকী সংক্ষেপে উত্তর দিল। বড়দির কথা বলার ধরন দেখে জোনাকী দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না।

কাপড়-চোপড় পরে লাকী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

শাখী মুখ বুজে হাসছিল।

'কি হল ?' জোনাকী তার পাশে দাঁড়ায়। 'খুব যেন হাসছিস !'

'লাকীর আজ মন খারাপ।' শাখী উত্তর করল।

জোনাকী মাথা নাড়ল।

'হুঁ, সেটা খুব বোঝা যাচ্ছে। দুদিন ধরে সুখেনদা আসছে না। সকাল থেকে মুখটা হাঁড়ি করে রেখেছে। তা ছাড়া বংশীদা যখন তোর কাছে এল, আমি একবার বাবার ঘরে উঁকি দিয়েছিলাম, দেখলাম বড়দি হাতের ঝাড়ন ফেলে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে।'

'কেবল গালে হাত দিয়ে ভাববে কেন ?' শাখী হি হি করে হেসে ফেলল। 'আমি টের পেয়েছি, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তখন তোকে বংশীর জন্য চায়ের কথা বলতে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েছি, বারান্দায় এসে হঠাৎ বাবার ঘরের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, আমাদের শোবার ঘরের পার্টিশানটার ফুটোর ওপর চোখ রেখে লাকী ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'বংশীদাকে দেখছিল, তোকে দেখছিল, তোদের কথা-টথা শুনতে চেয়েছিল আর কি !' জোনাকীও হাসল।

'এই জন্যই এমন গুম হয়ে আছে—বুঝলি, কেবল সুখেনের ভাবনা নয়, অন্যের সুখ দেখলেও লাকীর হিংসা আরম্ভ হয়।'

'এটা ভাল নয় বাবা, তোমার তো একজন লাভার রয়েছেই।' জোনাকী গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমার মনে হয় কি জানিস ?' শাখী ভুরু কোঁচকাল। 'সুখেনের সঙ্গে ওর ভালবাসাটা তেমন পাকা না। কাঁচা ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—যে কোন সময় ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে পারে।'

'কি জানি—পরের কথা কেমন করে বলব ?' জোনাকী ঠোঁট ওল্টাল। 'আমি আমার নিজেরটাই বলতে পারি কাঁচা কি পাকা !'

'তাও বটে।' শাথী সায় দিল। 'আমরা আমাদেরটা নিয়েই ভাবি—কিন্তু লাকী যেন পরের বেলায়ও নাক গলাতে চায়।'

'এটা খারাপ।' জোনাকী বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'এখন মনে হয় সুখেনদার খোঁজে বেরোল বড়দি।'

'মনে হয়।'

দুজনের চোখে তন্দ্রা এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর যেহেতু লাকী বেরিয়ে গেছে, জোনাকী শাথীদের ঘরের বিছানায় শাথীর পাশে এসে শুয়েছে। অন্যদিন বাবার ঘরে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে দিবানিদ্রা সারে।

॥ তিন ॥

বাস থেকে নেমে লাকী খুব আস্তে হাঁটছিল। চৈত্রের রোদ চনচন করছে। গা মাথা পুড়ে যায়। একটা সিনেমা-হলের ছায়ায় এসে সে দাঁড়াল।

ঠিক এমন জায়গায় বাস থেকে হঠাৎ নামল কেন লাকী নিজেই বুঝতে পারছিল না। তেষ্টা পেয়েছে খুব? ডাবের দোকানে কচি কচি ডাব ঝুলছে দেখে বাস থেকে নেমে পড়ল? না কি পান-সরবতের দোকানের সরবতের গেলাসগুলি হাতছানি দিয়ে ডাকল?

কিন্তু ডাব বা সরবৎ খাবার পয়সা তো সে আনেনি। নেইও তার কাছে। ঐ বাস-ভাড়ার দু-চার আনা।

হুঁ, সেটাই আসল কথা।

নতুনবাজার যাচ্ছে সে, তার মানে আরও দু স্টপ আগে বাস থেকে নেমে পড়ল। ক'টা পয়সা অন্তত বাঁচবে। আবার তো তাকে ফিরতে হবে। পয়সায় কুলোনো চাই।

সত্যি, এত কম পয়সা নিয়ে রাস্তায় বেরোতে কী যে খারাপ লাগে! ইচ্ছে করলেও তুমি একটা ডাব খেতে পার না, কি চা খেতে কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকতে পার না। নিজেকে কেমন ভিখিরি-ভিখিরি মনে হয়। শেয়ালদার রিফিউজি মনে হয়।

সিনেমা-হলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লাকী কপালের ঘামটা মুছল। দলে দলে সব মেয়েরা আসছে। একটু পরেই ম্যাটিনি শো। কী চমৎকার সব শাড়ি-জামা পরনে এক একজনের।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে লাকী দেখল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার সে হাঁটছিল। দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। সুখেন না? দোকান ফেলে সিনেমা দেখতে এসেছে?

কিন্তু পরক্ষণেই লাকীর চোখের ভুল ভাঙল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সে মানুষটার।

'কেমন, কথা ঠিক রেখেছি কিনা!' লাকী হেসে ফেলল।

'হুঁ।' এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে যুবকটি পরে আবার লাকীর চোখে চোখ রাখল।

'একলা এসেছ?'

লাকী আদুরে ভঙ্গি করে ঘাড় কাত করল।

'সিনেমা দেখবে—না কি একটা দোকানে ঢুকবে?'

'সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না।' লাকী মিষ্টি করে হাসল। 'তার চেয়ে বরং—'

'তবে তাই ভাল, এসো, ঐ দোকানটায় ঢোকা যাক।'

ছেলেটার সঙ্গে পা মিলিয়ে লাকী যখন হাঁটছিল, তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছিল। সিনেমা দেখতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে—তা হলে নতুনবাজারে সুখেনের কাছে যাওয়া হয় না। আসলে ও সুখেনের কাছে এসেছে। তার কাছ থেকে শেষ কথা না পাওয়া পর্যন্ত লাকী নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সুখেনের কথার ওপর এদিকের কথাটা ঝুলছে। কিন্তু একে—এই ছেলেকে তো আর এসব বলা যায় না? তাই একসঙ্গে দুটো ভাবনা বুকে নিয়ে লাকীর ভয়ও কম হচ্ছিল কি, আবার তার বুকের ভেতর আহ্লাদও হচ্ছিল খুব।

কাল বিকেলে শাখী যখন কলতলায় গা ধুচ্ছিল, জোনাকী বাবার ঘরে মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, তখন লাকী এই প্রথম পরিষ্কার করে হাতছানি দিতেই সাহস করে এই ছেলে—যার নাম প্রণব, আহা, নামটা কী সুন্দর! সামনের রাস্তাটা পার হয়ে সোজা লাকীদের জানালায় এসে দাঁড়াল। ক'দিন থেকে হলদে রঙের দোতলা বাড়ির এই ছেলের সঙ্গে চাওয়া-চাওয়ি চলছিল। কিন্তু মেয়েদের তরফ থেকে সাড়া না পেলে বেটাছেলের কতক্ষণ সাহস থাকে—

যে জন্য ফাঁক পেয়ে লাকী কাল বিকেলে হাতের ইশারায় তাকে ডেকেই বসল। পেটে ক্ষুধা নিয়ে চুপ করে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

দুজনে চায়ের দোকানে ঢুকল।

জোনাকীর ঘুম বেশি। কি রাত্রে কি দিনে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের সমুদ্রে ডুব দেয়। তাও কি একটুখানি ডুব দেওয়া। একেবারে সাত হাত জলের নিচে তলিয়ে যাওয়া।

শাথী শুধু এতক্ষণ ঘুমের ভান করছিল।

এখন উঠে বসল। ভাল করে জোনাকীর চোখ দুটো দেখল। শ্বাস পড়ার শব্দ শুনল। তারপর মাদুর ছেড়ে পা ফেলে জানালার কাছে সরে গেল।

সেই পাল্লা-ভাঙা জানালা।

লাকী বেরোবার সময় ময়লা সায়াটা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে।

তাই তো, দু-দুটো কুমারী বোন শুয়ে আছে, রাস্তা দিয়ে কত রকমের লোক যায় আসে, উঁকি-টুকি দিয়ে দেখে ফেলতে কতক্ষণ! ঘুমের মধ্যে সায়া-শাড়ি ঠিক থাকে নাকি মেয়েদের!

তাছাড়া যা গরম ছেড়েছে, শাথী পরিষ্কার দেখছিল জোনাকী ফ্রকটা খুলে রেখে কেবল নীচের জামাটা গায়ে রেখে হুসহাস নাক ডাকাচ্ছে। জোনাকীর গলার দিকের টুসটুসে ঘামাচিগুলো শাথীর চোখে পড়ছিল।

অন্যদিন হলে এখুনি জোনাকীর পাশে বসে পড়ে সব ক'টা ঘামাচি গেলে দিত শাথী। এই তার একটা বদ রোগ। কারো ঘামাচি দেখলে তার হাতের নখ ভীষণ চুলবুল্ করে।

কিন্তু এখন বসে বসে ঘাড় গুঁজে ছোটবোনের ঘামাচি গালবার সময় নেই।

জানালায় দাঁড়িয়ে সে ফাঁকা রাস্তাটা দেখছিল। একটা রিক্সা ঠুং ঠুং করে হেঁটে যাচ্ছে। সওয়ার নেই। তাই রিক্সাওয়ালার এমন ঢিমেতালে গতি।

হুঁ, রিক্সাওয়ালাও জানে নিমতলার এই ঘরে তিনটি পরী থাকে। অবশ্য রিক্সাওয়ালা জানে না, তিন পরীর এক পরী সুখেন পাল নামক লাভারের সঙ্গে দেখা করতে ভাত খেয়ে উঠেই বেরিয়েছে, এক কুমারী সাত হাত ঘুমের নিচে তলিয়ে আছে। জেগে আছে কেবল একজন। যার নাম শাখী। যার রূপের ছটায় ত্রিভুবন পাগল।

রিক্সাওয়ালা রোজ এখান দিয়ে যায় আসে। কাজেই এই জানালা তার চেনা। পরীদের দেখতে রিক্সাওয়ালা এদিকে ঘাড় ফেরাতে শাখীর বেদম হাসি পেল। হাসল না যদিও। রিক্সাওয়ালাও পুরুষ। সাধ-আহ্লাদ তারও পুরোমাত্রায় আছে। সারাদিন রোদে পুড়ে রিক্সা টানে বলে কি সুন্দর মুখ দেখতে তার শখ হয় না?

'এই।' হাতের ইশারা করে রিক্সাওয়ালাকে ডাকল শাখী। এমন করে ডাকল, সেই মুহূর্তে কেউ দেখলে ঠিক ভাবত শাখী বুঝি কালো হাড়-জিরজিরে রোগা লোকটার সঙ্গে প্রেম করছে। রোদে ঘুরে ঘুরে মুখটা পুড়ে গেছে। কপাল বেয়ে নাক বেয়ে ঘাম ঝরছে।

কিন্তু রিক্সাওয়ালার এমন বিদঘুটে কিছু কল্পনা করার সময়ই নেই। সে ঠিক বুঝল ছুঁড়ি তার সওয়ার হয়ে দুপুরে কোথাও চুপি-চুপি বেরোতে চাইছে। এইজন্যই হাতের ইশারা।

টের পেয়ে রিক্সাটা ঘুরিয়ে রিক্সাওয়ালা লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়াল।

শাখী চোখ বড় করে আর একবার জোনাকীকে দেখল। তারপর চট করে শাড়িটা ও গায়ের জামাটা বদলে নিয়ে দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে রেখে রাস্তায় নেমে এল।

কোন কথা না বলে সে রিক্সাতে চেপে বসল।

রিক্সাওয়ালা গাড়ির ডাণ্ডা দুটো তুলে নিয়ে তার মুখের দিকে

তাকাতেই শাখী চোখের ইশারা করে কিছু বলল। যেন এমন আরও ক'দিনই হয়েছে। লাকী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে জোনাকী ঘুমোচ্ছে, কি জোনাকী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে লাকী পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, সেই ফাঁকে সেই নিরালা তুপুরে জানালা দিয়ে হাতের ইশারা করে এই রিক্সাওয়ালাকেই ডেকেছে শাখী। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে রিক্সাওয়ালা ঠিক এই লাইটপোস্টের নিচে অপেক্ষা করেছে। শাখী পা টিপেটিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রিক্সায় উঠে বসেছে, তারপর চোখের ইশারা করে কোথায় যাবে জায়গাটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

তখন ঠুং ঠুং করে রিক্সা ছুটল।

প্রকাশ চাটুজ্যের ঘুম হয়ে গেছে। ঘরে পাখা নেই। গরমে ঘামে তেমন একটা ঘুম হয় না।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশবাবুর ঠাণ্ডা জল চাই।

'লাকী! লাকী!' তুবার ডেকে বড়মেয়ের সাড়া না পেয়ে প্রকাশবাবু মেজমেয়েকে ডাকলেন।

'শাখী! শাখী!'

তুবার ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে প্রকাশবাবু চুপ করে ভাঙা তালপাতার পাখাটা তুলে নিয়ে একটু বাতাস খেলেন। তারপর চেঁচিয়ে ছোটমেয়েকে ডাকলেন।

'জোনাকী! জোনাকী!'

হাতের পিঠ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে জোনাকী এসে দাঁড়াল।

'জল দে।'

জোনাকী কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে কলাই-করা গেলাসটা বাবার হাতে তুলে দিল।

জল খেয়ে প্রকাশবাবু একটু ঠাণ্ডা হলেন।

'ওরা কোথায় ? ঘুমোচ্ছে ?'

জোনাকী মাথা নাড়ে।

'বেরিয়েছে ?'

জোনাকী ঘাড় কাত করল।

'কোথায় গেল, সিনেমা-টিনেমায় ?' প্রকাশবাবু বিড় বিড় করে উঠলেন।

জোনাকী মনে মনে হাসল। যেন কত পয়সা দিচ্ছে বাবা তার মেয়েদের সিনেমা দেখতে! কাজেই জোনাকী চুপ করে রইল। বড়দি যে দুপুরে ভাত খেয়ে উঠেই বেরিয়েছে তা তো সে চোখেই দেখল। সম্ভবত সুখেনের খোঁজে গেছে। দুদিন সুখেনদা আসছে না। কিন্তু মেজদি কোথায় বেরোল জোনাকী ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। অথচ তার সঙ্গেই মেজদি শুয়েছিল। ছাড়া শাড়ি-জামা আলনায় ঝুলতে দেখে জোনাকী টের পেয়েছে শাখীও যেন এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল ? ওর তো বংশীর খোঁজে যাবার কথা নয়! এই তো খানিকক্ষণ আগে বংশীদা মেজদির সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে উঠে গেছে!

একটু একটু করে বেলা পড়ে আসছিল। গাছের ছায়া লম্বা হচ্ছিল। বাবাকে চা খাইয়ে জোনাকী এক কাপ চা নিয়ে বসল।

প্রকাশবাবু বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন।

হুঁ, গাছের ছায়া লম্বা হচ্ছিল। সামনে নিমগাছটায় পাখিদের কিচির মিচির বাড়ছিল। জোনাকীর চোখের পলক পড়ছে না। কত মানুষ আসছে যাচ্ছে। কিন্তু আর মানুষের দিকে জোনাকীর চোখ নেই। কেবল একটি মুখের প্রতীক্ষায় সে বসে আছে। একজনকে সে আশা করছে।

বাড়িতে কেউ নেই।

শূন্যতার মধ্যে জোনাকী থেকে থেকে কেমন হাঁপিয়ে উঠছিল।

ঠিক এমন সময় সে চমকে উঠল।

আরও দুদিন এই মানুষ এভাবে এই জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

হয়তো তখন বড়দি শুখেনের সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে, শাখী ঘুমোচ্ছে। জোনাকী একলা জানালায় দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঐ ইট-রঙের চারতলা বাড়ির ভদ্রলোক আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে ঠিক জোনাকীদের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হুঁ, দুপুরে, যখন রাস্তায় লোকজন নেই, গাড়িঘোড়া তেমন চলে না।

কিন্তু আজ যে রাস্তায় অনেক মানুষ। এখন বিকেল। দোকান-পাট সব খুলেছে।

তবু ভদ্রলোক এমন করে জোনাকীদের টালির ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

জোনাকী অবাক হল, খুশিও কম হল না।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে জোনাকী চোখ টিপল। পনেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু তার চোখ টেপা এবং হাবভাব দেখলে মনে হবে কুড়ি বছরের যুবতী তার কাছে হার মানবে। চারতলা বাড়ির মানুষটা নিশ্চিন্ত হল। প্রকাশবাবুদের জানালা থেকে সরে গিয়ে ভদ্রলোক রিক্সা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলেন।

জোনাকী জামাটা পাল্টে নিল। একটাই তার ভাল ফ্রক। হলদের ওপর লাল ফুটকি। গলার দিকটা সবুজ।

জামাটা পরলে এত সুন্দর দেখায় ওকে! একটুখানি পাউডার কৌটোর তলায় পড়ে আছে। যেটুকু ছিল উপুড় করে লাকী শাখী মুখে মেখে গেছে।

যাই হোক, এখন পাউডার স্নো নিয়ে মাথা গরম করলে চলবে না।

জোনাকীর হঠাৎ ভাবনা হল ঘর-দোর খোলা রেখে সে বেরোয় কি করে? অবশ্য এমন আগেও একদিন হয়েছে। পরেশের সঙ্গে সে

বেড়াতে গেছে। লাকী সুখেনের সঙ্গে বেরিয়েছিল। বাবাও তখন বেড়াতে বেরিয়েছে। এমন সময় বংশীদা এসেছিল সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে।

মেজদি কিন্তু বাড়ি খালি বলে বংশীদাকে ফিরিয়ে দেয়নি। কাপড়-চোপড় পরে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা কাঠ-কয়লা রাখার ছোট ঘরটার দরজার কাছে রেখে গিয়েছিল।

প্রকাশবাবুই একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, যদি তোরা কেউ বাড়িতে না থাকিস, আর আমিও বেরিয়ে যাই, ঘরে তালা দিয়ে চাবিটা কাঠ-কয়লা রাখার ঘরে চৌকাঠের মাথায় রেখে যাবি। কাজেই প্রথম যে বাড়িতে ঢুকবে তার তালা খুলে ঘরে ঢোকার আর কোন অসুবিধাই থাকবে না।

অর্থাৎ বাবা এটা সর্বদাই আশা করছিলেন, এ-বাড়িতে সুখেন আসছে লাকীর কাছে, বংশী আসছে শাখীর কাছে, পরেশ আসছে ছোটমেয়ের কাছে—একদিন হয়তো তিনজনই একসঙ্গে সিনেমার কি থিয়েটারের টিকিট কেটে নিয়ে এসে তিন বোনকে বলবে, চল। এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য এভাবে মেয়েরা সবাই যদি বেরিয়ে যায় প্রকাশবাবু কিন্তু চুপচাপ ঘরে বসে বিকেলটা নষ্ট করতে পারেন না, একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে না এলে তাঁর ক্ষুধা হবে না, রাত্রে ঘুম হবে না।

সেজন্যই বাবা এমন চমৎকার একটা রাস্তা বাতলে দিয়েছিলেন। বিচক্ষণ মানুষ। কাজেই জোনাকীও এখন একটুও দ্বিধা না করে দরজায় তালা ঝুলিয়ে চাবিটা যেখানে রাখার ঠিক রেখে দিয়ে হাসি-হাসি মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

একটা বড় অফিসে চাকরি করে সিদ্ধার্থ। চল্লিশের কাছে বয়েস। সন্তান একটিই। মেয়ে। ভারি ফুটফুটে চেহারা। কিন্তু সিদ্ধার্থর স্ত্রী বা মেয়ে এখানে থাকে না। অর্থাৎ সিদ্ধার্থর সঙ্গে থাকে না। স্ত্রী নিভা তার বাবার কাছে লখনৌতে থাকে। মেয়েটিও। ভদ্রলোক লখনৌর প্রবাসী বাঙালী। কাজেই সিদ্ধার্থ একেবারে ঝাড়া-হাত-পা। হুঁ, অনেকেই বলাবলি করে স্ত্রী কেন কাছে নেই, মেয়ে কেন বাবাকে ছেড়ে আছে!

শুনে সিদ্ধার্থ চুপ করে থাকে।

যদি হঠাৎ কেউ প্রশ্ন করে সিদ্ধার্থ তখন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—আমি গরীব মানুষ। রাজার হালে নিজে যেমন থাকতে পারি না, রাণীর হালে স্ত্রীকেও তেমন রাখতে পারি না। তাই তিনি তাঁর বড়-মানুষ বাবার কাছে থাকেন। সেখানে থেকেই মহিলা বেশি সুখ পান। মেয়ে এখনও ছোট। মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কাজেই মেয়েও সেখানে।

এটা একটা কথার কথা।

অথবা কথাই নয়।

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী আছে কী বা ঘটেছে, তা এই দুজনেই বলতে পারে। তা না হলে সিদ্ধার্থ যেখানে চার হাজার টাকার মতন মাইনে পায় সেখানে তার 'আমি গরীব, গরীবের মতন আছি'—এই কথা ধোপে টেঁকে না। সিদ্ধার্থবাবুর অন্য কেউ পুষ্যিও নেই।

হুঁ, আমরা যেটাকে নিমতলার রাস্তা বলি, আসলে সেটা হল উমাশঙ্কর কবিরাজ লেন। প্রকাশ চাটুজ্যের টালির ঘরটার সামনে

একটা পুরনো ঝুপড়ি-মাথা নিমগাছ দাঁড়িয়ে আছে বলে সোজাসুজি নিমতলার রাস্তা বলে লোকে খালাস।

সেই নিমতলার রাস্তার, অর্থাৎ উমাশঙ্কর কবিরাজ লেনের ওপর যে ক'টা বড় বড় বাড়ি আকাশ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটার চারতলার প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট নিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর আসলে রাজার হালেই আছে। একটা চাকর ও একটা ঠিকে ঝি নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর সংসার।

হুঁ, অনেক দেখেছে সিদ্ধার্থ প্রকাশ চাটুজ্যের এই মেয়েকে। যার নাম শাখী। সিদ্ধার্থর কাছে এই মেয়ে একটা আশ্চর্য কবিতার মতন।

এককালে যখন কলেজে পড়ত, সিদ্ধার্থর একটু-আধটু কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। এখন বড় চাকরিতে ঢুকে সে-সব ছাড়তে হয়েছে।

যাই হোক, কবিতার মতন এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটি সিদ্ধার্থর দিবারাত্রির স্বপ্ন।

আগে ক'দিন ধরেই চাওয়া-চাওয়ি চলছিল দুজনের মধ্যে। প্রথম থেকেই শাখীরও খুব ভাল লেগেছিল এই সুদর্শন মানুষটিকে। সিদ্ধার্থ যখন অফিস যেত, শাখী সংসারের সব কাজকর্ম ফেলে তাদের জানালায় এসে দাঁড়াত। আর একবার বিকেলে। সিদ্ধার্থ যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরত। কিন্তু এভাবে শুধু চোখের দেখায় তৃপ্তি ছিল কি?

এখন অবশ্য সব ঠিক হয়ে গেছে।

এখন দুজনের একত্র হবার জায়গার অভাব নেই।

যেমন আজ, এই চৈত্রের রৌদ্রের ঝলমল দুপুরে শাখী রিক্সায় চড়ে মানিকতলার খালের কাছে একটা বাবলা গাছের তলায় এসে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থ তার চকচকে সবুজ রঙের নতুন গাড়িটা নিয়ে অপেক্ষা

করছে। রিক্সা বিদায় করে দিয়ে শাখী প্রায় রাণীর মতন হাসতে হাসতে হেলে-দুলে গাড়িটার কাছে চলে এল।

সিদ্ধার্থ দরজা খুলে দিল। শাখী ভিতরে ঢুকল। দরজা আটকে দিয়ে সিদ্ধার্থ স্টিয়ারিংয়ের দিকে ঘুরে বসল। গাড়ি হাওয়ার বেগে ধর্মতলার দিকে ছুটল।

কিন্তু এইমাত্র জোনাকী যার কাছে এসে দাঁড়াল, সেই মানুষটির বয়স আর একটু বেশি। পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। রগের কাছে কিছু চুল পাকতে শুরু করেছে।

তা হলেও জোনাকী তার পরেশকে যেমন দেখে, পঞ্চাশ বছরের এই প্রবীণকেও যেন প্রায় সেই চোখে দেখে।

কোন বাঁধ নেই, সঙ্কোচ নেই। যেন সারদা রক্ষিতও তাই আশা করে।

পাখির মতন এই ছোট্ট মেয়েটার কাছে ধমক-টমক খেতেও যেন ভাল লাগবে সারদার।

একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

দুজনে উঠে বসল।

উমাশঙ্কর কবিরাজ লেনের চৌহদ্দি পার হয়ে জোনাকী সারদা রক্ষিতের পাশে সরে এসে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল। জোনাকীর একটা হাত কোলে টেনে নিয়ে সারদা আদর করতে লাগল।

ট্যাক্সি গড়ের মাঠের দিকে ছুটল।

'একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু!' জোনাকী ফিসফিসিয়ে বলল।

'কেন, ক'দিনের মধ্যে তো বেড়াতে যাওয়া হয়নি। বাড়ি ফেরার এত তাড়া কিসের?

'বাবা সন্দেহ করবে।'

'কিসের আবার সন্দেহ? তোমার তো একটা লাভার আছেই—কি যেন নাম ছোঁড়ার?'

'ধেৎ, ও আবার লাভার কিসের—বাড়িতে আসে, হুটো-একটা কথা বলি ওর সঙ্গে, এই পর্যন্ত। আমি পরেশকে খুব একটা আমল দিই না।'

'যাই হোক, প্রকাশবাবু ভাববেন তুমি তার সঙ্গেই বেড়াতে বেরিয়েছ কোথাও, কাজেই সন্দেহটা ওই ছোঁড়ার ওপর দিয়ে গেলেও তোমার বাবা বিরক্ত হবেন না।'

'না, তা হবেন না।' একটা ঢোক গিলে জোনাকী হাসল। 'বাবার ধারণা ওই দর্জির দোকানের ছোঁড়াকে আমি বিয়ে করব।'

'বেশ তো, ঐ ধারণা নিয়ে বুড়োকে থাকতে দাও—আমাদের সুবিধে।' সারদা রক্ষিত চাপা গলায় হাসল।

'কিন্তু এভাবে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'আহা, ভাল কি আমারই লাগছে—কিন্তু উপায় কি, আমাদের হুজনের এই বন্ধুত্বের ব্যাপারটা বড় বেশি গোপনীয়, জানাজানি হয়ে গেলে তোমারও বিপদ, আর আমার তো বোঝই—আমার গিন্নী তো এমনিই আমাকে সন্দেহ করছে—আমার চোখ হুটো নাকি কেবল টালির ঘরটার দিকে। রাতদিন খিটখিট করে। ছেলে হুটোও বড় হয়েছে। কাজেই—'

সারদা চুপ করল। ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলেছে। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তিনি বুঝি বাড়িতে নেই আজ?' জোনাকী শুধাল।

সারদা ঘাড় কাত করল।

'হুই ছেলেকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে গেছেন। তাই তো তোমাকে নিয়ে আজ আবার একটু বেড়াতে বেরোবার সুযোগ পেলাম।' একটু থেমে সারদা আবার বলল, 'খুব একটা সময় তো পাই না। কাজকর্ম নিয়ে সব সময় খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।'

জোনাকী এটা জানে। সব হয়তো জানে না। তবে ভদ্রলোকের কি সব যেন ব্যবসা-ট্যবসা আছে। সারাদিনই ছুটোছুটির মধ্যে থাকে।

ট্যাক্সি আবার চলতে আরম্ভ করল।

'চুপ করে আছ?' আদর করে সারদা বাঁ হাতের তেলো দিয়ে জোনাকীর থুত্‌নি নেড়ে দিল।

কিন্তু জোনাকী তবু কিছু বলছে না। চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটছে।

'কি হল, কথা বল!'

সারদা এবার জোনাকীর কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল।

'মাঝে মাঝে আমার খুব খারাপ লাগে।' জোনাকী ঠোঁট ফুলিয়ে কথাটা বলল।

'কেন, খারাপ লাগে কেন?' সারদা ভুরু কোঁচকাল।

'আমার হাত প্রায় সব সময়েই খালি থাকে, বাবা পেনশনের যে ক'টা টাকা পায়, সংসারেই সব খরচ হয়ে যায়—তা থেকে যে দুটো একটা টাকাও আমাদের—মেয়েদের হাত-খরচের জন্য দেবে—' বলতে বলতে জোনাকী থেমে গেল।

সারদা শব্দ করে হাসল।

'অ, সেই কথা!' বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সারদা রক্ষিত, 'ক' টাকা তোমার চাই বল? কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ?'

জোনাকী চুপ।

পকেট থেকে একসাথে দুটো দশ টাকার নোট তুলে আনল সারদা।

'নাও।'

কিন্তু জোনাকী টাকাটা ধরছে না। ভুরু কুঁচকে আছে।

'কি হল?'

'কুড়ি টাকায় আমার ক'দিন চলবে?'

'আবার দেব, যখনই চাইবে পাবে।'

'না।' জোনাকী নতুন করে ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে দিল। 'রোজ রোজ চাইতে বিচ্ছিরি লাগবে, লজ্জা করবে—'

'কী মুশকিল!' চাপা গলায় সারদা রক্ষিত হাসল। 'তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু। আমার কাছে চাইতে লজ্জার তো কিছু নেই।'

'তার চেয়ে একসঙ্গে কিছু বেশি করে দিয়ে দিলে হয় না?' জোনাকী ভুরু বাঁকিয়ে বলল, 'রোজ রোজ কারো কাছে টাকা চাওয়া যায় বুঝি?'

'একসঙ্গে কত চাইছ?'

'পাঁচশো।'

'বেশ তাই হবে—কিন্তু এখুনি তো সবটা দেওয়া সম্ভব না, এত টাকা সঙ্গে আনিনি।'

'এখুনি আমি চাইছি নাকি?' জোনাকী আবার হাসল।

'বেশ, তবে সোমবার নিও।' সারদাও একটু হাসল, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'কিন্তু কথা হচ্ছে এত টাকা তোমার কাছে রয়েছে দেখলে তোমার দিদিরা যদি সন্দেহ করে? তারা যদি প্রকাশবাবুকে বলে দেয়?'

'ইস্, দিদিরা জানবে কিনা আমি কোথায় টাকাটা রেখেছি! দিদিরা টের পেতে পারে অত কাঁচা মেয়ে আমি নই। আমি ঠিক লুকিয়ে রাখতে পারব—তারপর সময় সময় দু-চার-পাঁচ টাকা করে খরচ করব—ঘরের টিকটিকিটাও আমার এই টাকার কথা টের পাবে না।'

'ঠিক আছে।' সারদা খুশি হয়ে জোনাকীর পিঠে হাত রাখল। ময়দানের ফাঁকা সড়কে এসে গাড়ির স্পীড একেবার কমে গেল।

॥ পাঁচ ॥

টেবিলে দুহাত রেখে হাতের মাঝখানে শাখী মাথাটা গুঁজে রেখেছে।

তার বাঁকা সুন্দর পিঠটা দেখছিল সিদ্ধার্থ। বেশ সতর্ক চোখে দেখছিল। কেননা পিঠ যদি বেশি ওঠা-নামা করে বুঝতে হবে শাখী কাঁদছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের নড়াচড়া ও কান্নার ধমকের মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি।

মাথার উপর পাখাটা সোঁ সোঁ করে ঘুরছিল।

ফলে শাখীর মাথার চুলগুলি দুরন্ত চঞ্চল ঢেউ হয়ে নাচানাচি করছিল। অথবা মনে হচ্ছিল, যেন ছোট ছোট অসংখ্য বুনো লতা, একত্র কেউ মুঠো করে সব ধরে রেখেছে, আর ঝোড়ো হাওয়ায় সেগুলি অনর্গল কেবল কাঁপছে।

হুঁ, মদের টেবিল।

শাখীর সামনে একটা বীয়ারের গ্লাস। সিদ্ধার্থর সামনে হুইস্কি। প্লেটে শশার কুচি, ভাজা মাংস, আলু-সেদ্ধ, কত কি!

মনে হচ্ছিল সিদ্ধার্থ একাই খেয়ে যাচ্ছে। শাখী প্রায় কিছুই খাচ্ছে না।

'শোন।' আদর করে সিদ্ধার্থ ডাকল। পাশাপাশি বসেছে দুজন। তার পিঠে হাত রাখতে সিদ্ধার্থর অসুবিধা হচ্ছিল না। এখন শাখীর কোমরে হাত রাখল।

শাখী মুখ তুলল।

'একটা কথা বলব?' সিদ্ধার্থ ঘাড় বাঁকালো।

'তুমি তো প্রথম থেকে বলে যাচ্ছ – বল, আমি কি না করেছি?' শাখীর চোখ দুটো করমচা-লাল। বোঝা যায় একটু আগে

কান্নাকাটি করেছে। নিবিড় করে কেঁদেছে। বুকে-পিঠে আলোড়ন তুলে হুঁসহাস করে কিছু কাঁদেনি। মেয়ের চোখের কিনারে অস্পষ্ট জলের রেখা দেখল সিদ্ধার্থ।

'তুমি এখনি এই মুহূর্তে একটা কিছু করতে বলছ আমায়—কিন্তু বলতে কি, ঠিক এই মুহূর্তে একটা কিছু করে ফেলা কি সম্ভব?'

'কখন সম্ভব?' যেন আর এক খাবলা কান্না রুখতে শাখী বড় করে ঢোক গিলল। 'কবে সম্ভব হবে শুনি?'

'হবে হবে।' ঘাড় নেড়ে সিদ্ধার্থ গ্লাসটা তুলে এক চুমুক খেল। 'এখানে আমি কিছুই করব না—' সিদ্ধার্থ সিগারেট ধরাল। চোখ দুটো ছোট করে সামনের দিকে তাকাল। চৌরঙ্গী-পাড়ার অভিজাত বার। ভিড় নেই, হৈ-চৈ নেই। বিশেষ করে এই কামরায় শুধুই তারা দুজন। 'কলকাতায়, যেখানে পাশাপাশি বাড়ি আমাদের, কিছু করতে যাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'বৌদি এখানে নেই, মেয়ে নেই—' ভুরু কুঁচকে শাখী বিড় বিড় করে উঠল। 'আটকাচ্ছে কোথায়?'

'ওরে ব্বাস—তোমার বাবাকে ভীষণ ভয় করে। ওই মানুষের সামনে ভুল করেও তোমাদের জানালার দিকে তাকাতে পারি না। এমন করে তাকায় যেন, আমার সব ক'টা হাড় কুড়মুড় করে চিবিয়ে খাবে।'

'তোমার হাড় অনেক বেশি শক্ত।' শাখী খোঁচা দেওয়ার মতন করে বলল। 'তা ছাড়া আমার বাবার সব দাঁত নড়ছে, ক'টা পড়েও গেছে।'

সিদ্ধার্থ কথা না বলে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করল।

'খাও।' থুত্‌নি নেড়ে শাখীর গ্লাসটা দেখাল সে।

'একটুখানি খেয়েছি, আর খাব না, ভীষণ তেতো।'

'একটুকরো মাংস মুখে ফেলে দাও।'

শাখীর লাল চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'দেখ, এখানে আমি তোমার সঙ্গে মদ খেয়ে কেবল ফূর্তি করতে আসিনি।' শাখী রীতিমত ধমক লাগাল।

আশ্চর্যের কিছুই না। প্রকাশ চাটুজ্যের পনেরো বছরের জোনাকী যদি পঞ্চাশ বছরের সারদা রক্ষিতকে ধমক দিতে পারে, ভুরু কুঁচকে সাবধান করতে পারে, সতেরো বছরের শাখী, জোনাকীর বোন, প্রকাশ চাটুজ্যের আর এক ডানাকাটা পরী, চল্লিশ বছরের সিদ্ধার্থকে ধমকাতে না পারার কিছু নেই।

'রোজ কি আর এসব জায়গায় তোমাকে নিয়ে আসা হয়?' নরম গলায় সিদ্ধার্থ বলল, 'এই নিয়ে বোধ করি তিনদিন।'

'আর কোনদিন আমাকে এখানে আনবে না।'

'না, আনব না।'

'এখন তুমি কি ঠিক করেছ—এভাবে আমাকে ঝুলিয়ে রাখবে?'

'শোন, যা বলছিলাম—অফিস থেকে আমাকে জার্মানী পাঠাচ্ছে—একবার যদি সেখানে যেতে পারি, আর ফিরব না—এবং যাতে জিনিসটা সকাল সকাল হয়ে যায় আমিও খুব চেষ্টা করছি।'

'তাতে আমার কী হবে—তুমি জার্মানী যাও, আমেরিকা যাও—আমার কিছু লাভ আছে?'

'বোকা মেয়ে!' সিদ্ধার্থ গলার নিচে হাসল। 'আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই—অপেক্ষাটা সেই জন্যই।'

হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরোল না শাখীর। চোখের পলক পড়ল না—যেন শ্বাস ফেলতেও এক মিনিট ভুলে থাকল।

'আর কোনদিন না।' শাখীর স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ আস্তে মাথা ঝাঁকাল। সামান্য সময় চুপ থেকে পরে বলল, 'সেখানেই যা করার আমরা করব—এখানে কিছু করার ভয়ানক অসুবিধে—বুঝতে পারছ।'

'অসুবিধে কেন থাকবে?' শাখীর কপালের চামড়া আবার কুঁচকে উঠল। 'বৌদির সঙ্গে তো তোমার এক রকম সম্পর্ক নেই-ই

বলতে গেলে, বছরের পর বছর লখনৌ পড়ে আছে, তুমিই বলেছ—তবে আর বাধা কোথায় ?'

'তা হলেও, ওই ব্যক্তি যদ্দিন বেঁচে আছে, যেহেতু আমার স্ত্রী, আর কাউকে আমার বিয়ে করার আইনগত বাধা আছে। তার আগে কোর্ট-কাছারি করে ওর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ভাঙতে হবে।'

'তা ভেঙে দিচ্ছ না কেন ?'

'অনেক ঝঞ্ঝাট, বুঝলে, আর তোমাকেও অনেকদিন তা হলে অপেক্ষা করতে হবে।'

'না না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

'তাই বলছিলাম এটাই বরং সোজা—এভাবেই সহজ—আমরা বার্লিন চলে যাব। এইটুকুন খেয়ে ফেল।' সিদ্ধার্থ আঙুল দিয়ে শাখীর গ্লাসটা দেখাল।

একচুমুকে সবটা গিলে শাখী মুখটা বিকৃত করল, থুতু ফেলল। একটুকরো শশা মুখে দিল।

'কাজেই তোমার অধৈর্য হবার কিছু নেই।' সিদ্ধার্থ বলল, 'কিন্তু একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে—যে জন্য আজ এখানে তোমাকে নিয়ে এসেছি।'

'কি কথা ?'

'ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে তোমার মেলামেশা বন্ধ করতে হবে।'

'কার কথা বলছ ?' যেন আকাশ থেকে পড়ল শাখী। কি যেন একটু ভাবল, তারপর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'বংশীর কথা বলছ তো ?'

'হুঁ।'

'কেন, ও তো আমাদের কিছু ক্ষতি করছে না ?'

'আমার ভাল লাগে না—আমি একদম ছোঁড়াকে সহ্য করতে পারছি না। ট্যাক্সি চালায়, তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবে, তার সঙ্গে

তুমি সিনেমা দেখতে যাবে, বেড়াতে বেরোবে—ভাবতেও আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

'ইস, তুমি কী বোকা!'

'তুমি তো জান আমি কতবড় একটা অফিসার—লেখাপড়া-জানা লোক।'

'হলেই বা', শাখী ঘাড় বাঁকাল, 'বংশী লেখাপড়া জানে না ঠিকই—তোমার মতন বড়লোকও নয়, ট্যাক্সি চালায়—কিন্তু খুব ভাল ছেলে—বাবা ওকে খুব পছন্দ করে।'

'ধেৎ ধেৎ!' সিদ্ধার্থ মুখ বাঁকাল। 'তোমার বাবা তাকে পছন্দ করতে পারে, আমি কেন একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সহ্য করব বল—বিশেষ করে যখন তোমার সঙ্গে সে কথা বলে, তাকে নিয়ে তুমি বেড়াতে বেরোও, খুব খারাপ লাগে দেখতে।'

'তোমার কি ধারণা আমি তাকে ভালবাসি, আমার লাভার সে?'

'তুমি ভালবাসতে না পার—সে তোমাকে ভালবাসে—আজও দেখলাম দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা তোমাদের বাড়িতে কাটিয়ে তারপর ছোঁড়া বেরিয়ে এল।'

'তুমি বুঝি তোমার চারতলার ফ্ল্যাট থেকে ততক্ষণ তাকিয়ে দেখছিলে!' শাখী হাসবার একটা ভঙ্গি করল।

সিদ্ধার্থ গম্ভীর হয়ে রইল।

'বংশী আছে বলেই তো যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোতে সুযোগ পাই, তোমার কাছে চলে আসতে পারি—বাবা ভাবে আমি বংশীর কাছেই যাচ্ছি।'

'না, দরকার নেই এই মুখোশের। আমার কাছে কম আস তা-ও ভাল, তবু আমি চাইছি ঐ ছোঁড়াকে বিদেয় কর।'

'সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস কর, ওর সঙ্গে আমার প্রেম-ট্রেম কিছু নেই।'

'দরকার নেই আমার বিশ্বাস করার।' সিদ্ধার্থ এবার গোঁয়ারের

মতন মাথা ঝাঁকাল। 'নেই, কিন্তু যেমন মাখামাখি দেখি দুজনের —প্রেম জন্মাতেই বা কতক্ষণ ?'

'না না না, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না, বাসি না।'

'তা হলেও ওর সঙ্গে মেলামেশা তোমাকে ছাড়তে হবে। হুঁ, যদি আমাকে চাও, যদি আমাকে আশা কর।'

শাখী আর কিছু বলল না। বয়কে ডেকে সিদ্ধার্থ আর এক পেগ হুইস্কি নিল।

'কাল থেকে যেন ওই ছোঁড়া তোমাদের বাড়িতে আর না আসে।' বেশ কড়া সুরে কথাটা বলে সিদ্ধার্থ গ্লাসে চুমুক দিল।

শাখী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'খুব ভাবনায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে ?' সিদ্ধার্থ ট্যারা চোখে শাখীকে দেখল।

'ভাবনা নয়, খুব বিপদে ফেললে আমাকে।'

'কি রকম ?'

'ওকে যদি এ-বাড়ি আসতে বারণ করতে হয় তো এখুনি দু হাজার টাকা ওর হাতে দিতে হয়।'

'সে আবার কি —টাকা কেন ?' সিদ্ধার্থর ভুরু দুটো কপালে উঠল।

'দু হাজার টাকা দিয়ে বাবাকে সে সাহায্য করেছিল—আমি বলেছিলাম, আমার কথা সে রেখেছিল। কষ্টে-সৃষ্টে ঐ হাজার দুই টাকাই বংশী জমিয়েছিল—কিন্তু বাবার পেনশনের টাকায় আমাদের সংসার এদিকে আর চলছিল না—পুজোর সময় সে সব টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে বাবার হাতে দেয়।'

'তুমিও যেমন, তোমার বাবাও তেমনি—অদ্ভুত! একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছে হাত পাততে গেলে!' সিদ্ধার্থ নাকের শব্দ করে হাসল। 'কেন, আমার কাছে চাইতে দোষ ছিল কি—'

'তখন তোমার সঙ্গে এত ভাল করে পরিচয় হয়নি আমার, এতটা মিশিনি যে।'

'ঠিক আছে, দু হাজার টাকা কালই দিয়ে দিচ্ছি—ওই ছোঁড়াকে ফিরিয়ে দাও—কোনদিন যেন তোমাদের বাড়ি আর সে না আসে।'

শাখী চুপ করে হাতের নখ খুঁটছিল।

'বার্লিন চলে গেলে তো আর কথাই নেই।' সিদ্ধার্থর গলার স্বর গম্ গম্ করছিল। 'কিন্তু যতদিন আমাদের না যাওয়া হচ্ছে ততদিন আমি চাই না তুমি আর কারো সঙ্গে মেলামেশা কর। বুঝেছ?'

'ঠিক আছে।' শাখী ঘাড় বাঁকালো। টাকাটা কাল দিয়ে দিও।'

গুড়ের কারবারী সুখেনের মুখটা কেমন ভার ভার। হাতে ব্যাগটা ঝুলিয়ে লাকী দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যদিন লাকীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুখেন দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। আজ সে-রকম কিছু করল না। বা দোকানের সামনে একটা বেঞ্চি আছে, লাকীকে বসতেও বলল না। অবশ্য বললেও লাকী কোনদিনই এই বেঞ্চিতে বসে না। খুব খারাপ লাগে এমন খোলামেলা বাজারে একটা গুড়ের দোকানের সামনে বেঞ্চির ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে। বাজারের হাজারটা মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কাজেই সুখেনই দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। দুজনে অন্য কোথাও নিরিবিলি জায়গায় বা কোন চায়ের দোকান-টোকানে গিয়ে বসে।

তা ছাড়া সুখেনই তো লাকীদের বাড়ি যায়। বাজারে সুখেনের কাছে লাকীর তেমন একটা আসতে হয় কোথায়?

আজ কিন্তু লাকী না এসে পারল না। সন্ধ্যা হয়-হয় করছে এখনই রাস্তার দোকানের হাজারটা আলো জ্বলে উঠবে।

সুখেনের সঙ্গে তার জরুরী কথা আছে। দুদিন সুখেন ডুব দিয়ে আছে কেন? লাকীদের বাড়ি যাচ্ছে না কেন? সুখেন কি এখন থেকেই পিছু হঠছে? কথাটা তুলতেই ভয় পেয়ে গেল? লাকী কপালের ঘাম মুছল।

'বোসো।' লাকীর দিকে তাকিয়ে সুখেন বলল।

'আমার বসবার সময় নেই।' লাকী মুখ কালো করে জবাব দিল।

যেন দু মিনিট কি চিন্তা করল সুখেন। নিচু গলায় কর্মচারীকে কিছু একটা বলল। তারপর হুক থেকে জামাটা টেনে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

'চায়ের দোকানে বসবে?'

'তাই চল।' লাকী যে এতক্ষণ—প্রায় দুঘণ্টা একটা চায়ের দোকানে কাটিয়ে এসেছে, সুখেনের তো তা আর জানবার কথা না। তাই চায়ের দোকানের প্রস্তাব শুনে লাকীর হাসি পেল। হাসল না।

ধারে-কাছেই একটা দোকান চোখে পড়তে দুজন ঢুকে পড়ল। পর্দা-ঘেরা একটা নিরিবিলি খোপও পাওয়া গেল।

'তোমার কি হয়েছে শুনি?' হাতের ব্যাগটা একপাশে রেখে লাকী বলল।

'আমার যা হয়েছে না—' নাক দিয়ে কেমনতর একটা শব্দ বের করল সুখেন, 'আমি আর আমার মধ্যে নেই।'

'কি হয়েছে?'

'আমার সর্বনাশ হয়েছে—অবশ্য একলা আমার নয়, আমার, আমার বাবার, আমাদের পরিবারের সকলের।'

'কেন?' লাকীর চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে গেল।

'আমাদের পাঁচশো মণ গুড় নিয়ে একটা নৌকা ইছামতীর জলে ডুবে গেছে।'

'তারপর ?' এমন অদ্ভুত কথা লাকী আর কোনদিন শোনেনি। এক সেকেণ্ড চুপ থেকে সুখেনের মুখটা দেখল। তারপর একটা ঢোক গিলে আস্তে বলল, 'কোথা থেকে গুড় আসছিল ?'

'সে তুমি জানবে না। জানবার দরকারও নেই—মাঝপথে ঝড় উঠে এত এত গুড় নিয়ে নৌকাটা ডুবে গেল। আমাদের দু লাখ টাকার ওপর ক্ষতি !'

পাঁচশো মণ গুড়ের দাম দু লাখ টাকা কিনা চট করে হিসাব করা লাকীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা চুপ করে থেকে সুখেনের কথাই শুনল। তার চোখ-মুখ দেখল।

'বুঝলে, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, বাবারও একই অবস্থা, আমাদের সকলেরই আজ দুটো দিন যা কাটছে—আমার বড়দার তো মাথা খারাপ হবার মতন অবস্থা।'

লাকী চুপ।

'এখন কি করি কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না। এতবড় একটা লোকসান সামলে উঠতে বেশ কিছুদিন লাগবে।'

'শুধু দুকাপ চায়ের কথাই বলে দাও।' বয় এসে দাঁড়াতে লাকী সুখেনকে বলল।

'কিছু খাবে না ?'

লাকী মাথা নাড়ল।

যেন ভিতরে ভিতরে সুখেন খুশিই হল। অন্য কিছু খেতে গেলেই দুটো টাকা ঠিক বেরিয়ে যাবে। এদিকে তাদের কারবারের এই অবস্থা। দুকাপ চায়ের দাম আর তেমন কি !

কিন্তু সুখেন জানে না লাকী পেট ভরে আর একটা দোকানে বসে এই মাত্র চপ কাটলেট মোগলাই পরোটা পুডিং এবং আরও একটা কী যেন খেয়ে এসেছে। বড়লোকের ছেলে প্রণব খাইয়েছে। প্রণবের সঙ্গে নতুন খাতির জমতে আরম্ভ করেছে প্রকাশ চাটুজ্যের বড়মেয়ে লাকীর। তবু লাকী যে সুখেনের কাছে ছুটে এসেছে—খুবই একটা

জরুরী বিষয় জানতে। কিন্তু সুখেনের যেমন মনের অবস্থা—এই মুহূর্তে এসব কথা চিন্তা করার মত তার সময় কোথায়!

চা এল।

'নাও।' সুখেন একটা কাপ লাকীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে একটা টেনে নিল।

'তারপর, তোমার খবর কি?' চায়ে চুমুক দিয়ে সুখেন লাকীর চোখের দিকে তাকাল।

'আমার আর খবর কি—সব খবর তো তোমার কাছে জমা ছিল' গম্ভীর হয়ে লাকী উত্তর দিল।

'হুঁ, তা বুঝতে পেরেছি'—সুখেন মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু— কাথাটা বলতে আরম্ভ করেও সুখেন চুপ করে রইল।

'কি হল?' লাকী ভুরু কোঁচকাল। তারপর মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছিল সেদিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে একটু রুক্ষ গলায় বলল, 'জানি—আজ তুমি বলবে আমাদের গুড়ের নৌকা ডুবে গেছে, দু লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে—এখন আমার এসব জিনিস জানবার সময় নেই।'

সুখেন নীরব।

'দু মাস আগে যখন কথাটা তুলেছিলাম, তখন বলেছিলে তোমার মা-র হার্টের অসুখের খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে—সেই অবস্থায় এসব জিনিস চিন্তা করার তোমার সময় হচ্ছিল না।'

সুখেনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

'আমি কি মিথ্যে কথা বলেছিলাম—তখন কি আমার মা-র অসুখের বাড়াবাড়ি হচ্ছিল না?'

লাকী চুপ।

'এখন আমাদের গুড়ের নৌকা ডুবে গিয়ে আমরা প্রায় পথে দাঁড়িয়েছি—কারবার রাখতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আজ আমার কথাটা বিশ্বাস করতেই চাইছ না।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করছি।' লাকীর দুচোখ জ্বলে উঠল। কাঁধ সোজা করে বসল সে। 'কিন্তু এভাবে একটার পর একটা তোমার যদি বিপদ আসতে থাকে 'তো এই অবস্থায় আমাকে কী করতে হবে বলতে পার? এভাবে কতকাল আমি ঝুলব—আমি মানুষ, আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে!'

সুখেন কথা না বলে সিগারেট টানছিল।

'আমি বাড়ির বড়মেয়ে—আমার একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত শাখী, জোনাকীও কিছু করতে পারছে না—দুজনের রাস্তা আমি আটকে রেখেছি, এদিকে যখনই কথাটা তুলতে যাই, তুমি কখনো মায়ের হার্টের অসুখ দেখাচ্ছ, কখনো নৌকো ভরাডুবি হবার কথা শোনাচ্ছ।'

'কী মুশকিল!' সুখেন তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে একটা আক্ষেপের শব্দ করল। 'আমার কী ইচ্ছে করে না, আজই এখনই বিয়ে করে তোমায় নিয়ে ঘর-সংসার আরম্ভ করি—'

'একদিন একটু মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া আমাদের হয় না। আর তুমি কিনা কবে আমাকে বিয়ে করে ঘরের বৌ করে নিয়ে যাবে সেই আশায় আমি গাছের পাতা গুন্‌তে থাকব!' ব্যাগটা হাতে নিয়ে লাকী উঠে পড়ল।

সুখেনও চেয়ার ছেড়ে উঠল। দোকান থেকে বেরিয়ে লাকী বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতে থাকে। সুখেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল।

'ঠিক আছে, আর তোমাকে আসতে হবে না।' লাকী বলল।

যেন অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করে সুখেনও বলল, 'আমি চেষ্টা করব, বুঝেছ, যদি কারো কাছ থেকে শ' দুই টাকা ধার করতে পারি —কাল যাব।'

লাকী শুধু ঘাড়টা কাত করল। ঘাড় ফিরিয়ে সুখেনের মুখের দিকে আর তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না। একটা হাসি ঠোঁটের কোণায় লুকিয়ে বড় বড় পা ফেলে স্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটল। যেন ওদিক থেকে একটা বাস আসছিল।

॥ ছয় ॥

যেমন তিন মেয়ের রূপ, তেমনি তাদের বুদ্ধি। লাকী, শাখী ও জোনাকীর বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর প্রকাশ চাটুজ্যের অগাধ শ্রদ্ধা, অসীম বিশ্বাস।

মা নেই এতৎসত্ত্বেও তিন মেয়ে যেমন বুঝে-সুঝে চলছে সংসারে, এমন ক'টা মেয়ে চলতে পারে? এদিক থেকে প্রকাশবাবুর আত্ম-তৃপ্তির শেষ নেই।

তাঁর তিন মেয়েই যে ভবিষ্যতের রাস্তা বুদ্ধি করে বাতলে নেবে—*মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে যখন চিরকাল কিছু প্রকাশবাবুর সংসারে* ঝুলবে না, হুঁ, যে যার রাস্তা সুন্দরভাবে চিনে নিচ্ছে—গুড়ের কারবারী সুখেন, ট্যাক্সি-চালক বংশী এবং দর্জির দোকানের পরেশ ছোঁড়ার এ-বাড়ি আনাগোনা দেখেই তিনি সেটা ধরে ফেলেছেন—কাজেই এদিক থেকেও প্রকাশবাবু কম নিশ্চিন্ত কি?

কন্যাদের বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে বাবার ব্লাডপ্রেসার বাড়ুক মেয়েরা কখনই তা চাইছে না।

কাজেই মনে মনে তাদের বুদ্ধির প্রশংসা না করে তিনি পারেন? এসব চিন্তা করলে প্রকাশবাবু সত্যি সুখী মানুষ। নিশ্চিন্ত পুরুষ।

অথচ কেমন একখানা পাড়া! প্রকাশবাবু এও চিন্তা করেন।

কতরকম হাওয়া লাকী শাখী জোনাকীর গায়ে লাগতে পারত। লাগেনি।

নিশ্চয়ই, প্রকাশবাবু অনেক সময় ভাবেন, এদের, ভুঁড়িমোটা বাবুদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, টাকা-পয়সার ভাবনা নেই, যে জন্য বাজে ভাবনা-চিন্তা সারাক্ষণ মাথায় নিয়ে সব ঘুরছে। ঘরে বৌ থাকতে পরের ঘরে বৌয়ের দিকে

মেয়ের দিকে দৃষ্টি। নিজেদের ঘরে অশান্তি রেখে আর একজনের ঘরের শান্তি, আর এক সংসারের শৃঙ্খলা নষ্ট করতে এক একজনে ওস্তাদ।

হুঁ, আর শিক্ষিত লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক! প্রকাশবাবু দু-চোখে এই মানুষগুলিকে দেখতে পারেন না; তাদের গাড়ি-বাড়ির কোন মূল্যই তিনি দেন না।

হুঁ, প্রকাশবাবু খুব লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষিত বাবুরা কেমন চোখ টেরা করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাঁর মেয়েদের দিকে তাকায়। তখনই প্রকাশবাবু মনে মনে হেসে কথাটার পুনরাবৃত্তি করেন, বেল পাকলে কাকের আশা কোথায়?

আমার লাকী কোনদিনই সুখেনকে ছেড়ে তোমাদের দিকে চোখ ফেরাবে না। শাখীও বংশীকে ছেড়ে অন্যদিকে তাকাবার মেয়ে নয়। জোনাকী তো নয়ই।

প্রকাশবাবুর ধারণা তিন বোনের মধ্যে জোনাকীই সবচেয়ে বুদ্ধি রাখে, সবচেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলে। পনেরো বছর মোটে তো বয়স হল।

বিকেলে বেড়ানো সেরে সেদিন বাড়ি ফিরে প্রকাশবাবু দেখলেন ঘরে তালা ঝুলছে।

দেখে একটুও অবাক হলেন না তিনি।

তিন মেয়েই বেরিয়েছে। হুঁ, ছোটমেয়ে জোনাকী সকলের শেষে বেরিয়েছে। বাবাকে চা খাইয়ে গেছে। কাজেই জোনাকী যে ঘরে তালা ঝুলিয়ে গেল, প্রকাশবাবু বেশ বুঝতে পারছেন।

নিশ্চয় চাবিটাও জোনাকী ঠিক জাগয়াতেই রেখে গেছে। চিন্তা করে তিনি আর চাবি খুঁজতে কাঠ-কয়লার ঘরের দিকে গেলেন না, আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আর একটু বেড়ানো যাবে, মন্দ কি! প্রকাশবাবু পার্কের দিকে হেঁটে চলে গেলেন।

বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই দেখে পরেশ অবাক হল। ঘোর ঘোর সন্ধ্যা। ঠিক এই সময়ই জোনাকী বাড়িতে থাকবে কথা ছিল না? পরেশকে কাল বার বার করে বলে দিয়েছিল, সন্ধ্যার মুখে তুমি এসো—জরুরী কথা আছে। কোথায় গেল মেয়ে তা হলে! ঘরে তালা ঝুলছে!

একঠোঙা চিনেবাদাম এনেছিল সে আজ জোনাকীর জন্য। দেখা না পেয়ে পরেশের মনটা বেশ দমে গেল। প্রথমটা ভাবল জোনাকী হয়তো ধারে-কাছে কোথাও গিয়েছে। কাজেই অন্তত পাঁচ সাত দশ মিনিট কি আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে কিনা ভাবল।

কিন্তু এভাবে খালি বাড়িতে সে দাঁড়ায় কোথায়?

খুবই খারাপ লাগছিল তার।

ভিতরে উঁকি দিয়ে কাঠ-কয়লার খুপরিটা দেখল। সেটার অবশ্য দরজা খোলা। ওখানে বসেই জোনাকীর সঙ্গে সে প্রেমের গল্প করে।

যাই হোক, আধঘণ্টা অপেক্ষা করা যাক, কিন্তু খালি বাড়িতে না, পরেশ রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানের দিকে চলল।

দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে সে ভাবতে লাগল, এভাবে কথা দিয়ে জোনাকী তো কখনো কথার নড়-চড় করে না!

বস্তুত বাড়ি খালি রেখে বাকি মানুষগুলিই বা কোথায় যেতে পারে ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

চা খেতে বসে খুব একটা শান্তি পেল না সে। দারুণ ভিড় দোকানটায়—বিশেষ করে এই সন্ধ্যার মুখে।

খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল সে। কোনরকমে চা-টুকু শেষ করে পরেশ বেরিয়ে এল।

না, আধঘণ্টাও সে বসল না দোকানে, বসলে ভাল করত; এখনি যে আবার যাচ্ছে, যদি গিয়ে দেখে জোনাকী ফেরেনি! কিন্তু তার

যে মন মানছিল না। পা পা করে প্রকাশ চাটুজ্যের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। নিমগাছটার কাছাকাছি এসে সে আশ্বস্ত হল। জানালা দিয়ে একফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না ?

পরেশ খুশি হয়ে লম্বা করে পা ফেলল। জোনাকী ফিরেছে।

বাড়ির সামনের দরজা বন্ধ। পিছনের দরজা খোলা। কাজেই পরেশ ঘুরে পিছনদিকের সরু রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। পরেশ অবাক হল না। বড় ঘরে আলো নেই। মানুষও নেই। সামনের ছোট ঘরটা খোলা।

তাই বল! দিদিরা নেই বলে জোনাকী এখন সেই ঘরে বসে পরেশের জন্য অপেক্ষা করছে। বড় আলোটা জ্বালেনি, একটা ছোট মোমবাতি জ্বেলেছে। নিশ্চয় আজ লাকী শাখী, পরেশ চিন্তা করল, তাদের ওই গুড়-বেচিয়ে ও ট্যাক্সি-চালিয়ে লাভার দুটোর সঙ্গে সিনেমা-টিনেমা দেখতে গেছে।

বস্তুত জোনাকীর বড়দি ও মেজদির যে কী পছন্দ! নতুনবাজারে গুড় বেচে এক ছোঁড়া, তাকেই লাকীর ভাল লেগে গেল। আর শাখী কিনা বেছে নিয়েছে এক ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে। মনে মনে হেসে পরেশ পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল।

আবছা আলোয় বোঝা যাচ্ছিল না, জোনাকী ওপাশে বেড়ার দিকে ঘুরে বসে ঠিক এই সময়টায় একলা কী যেন করছে। ওফ্, মেয়ে আজ ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। বোনদের কোন লাভারের সঙ্গে তুমিও কি সিনেমায় গেছলে, ততক্ষণাৎ চেঁচিয়ে পরেশের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু না, এখন আওয়াজ-টাওয়াজ দেবে না, চোরের মতন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পিছন থেকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে জোনাকীর চোখ দুটো সে জোরে চেপে ধরল।

'আঃ! কী হচ্ছে!' মেয়ে চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূত দেখে ভয় পাওয়া মানুষের মতন পরেশের হাত-পাও অবশ হয়ে গেল। তখনি দুহাত গুটিয়ে নিল সে।

কিন্তু চমকে উঠলেও, ঘুরে দাঁড়িয়ে পরেশকে দেখে লাকী হেসে ফেলল।

'ভেবেছিলে তোমার জোনাকী, তাই না?'

লজ্জায় পরেশ কথা বলতে পারছিল না।

'বোসো বোসো।' লাকী পরেশকে খাতির করল। ছেলেটিকে তার খারাপ লাগে না।

'কখন বেরিয়েছে ও?' অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছিল পরেশের। তাহলেও চোখ তুলে লাকীর দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হাসল।

'ওর কি বেরোবার কিছু ঠিক থাকে!' লাকী ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। 'সারাদিনই তো বাইরে বাইরে—ঘরে আর কতক্ষণ থাকে মেয়ে?'

শুনে পরেশ চুপ করে রইল।

'তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে কেন?' জলচৌকিটা টেনে দিল লাকী। ছোটবোনের প্রেমিক, কিন্তু লাকীর বেশ ভাল লাগে এই ছেলেটিকে, অনেকটা যেন তার প্রণবের মতন দেখতে। সুখেনকে লাকীর অনেক-দিন থেকেই ভাল লাগছে না, কেমন চোয়াড়ে দেখতে হয়ে গেছে মুখটা, যেন এই বয়সেই সুখেন বুড়িয়ে গেল, সেই তুলনায় প্রণবের মতন পরেশকেও ভারি কচি মনে হয় না কি! লাকীর চোখের পলক পড়ছিল না। ফ্যাল ফ্যাল করে পরেশকে দেখছিল।

'সারাদিনই ও খুব ঘোরাঘুরি করে বুঝি?'

পরেশও চোখের পলক ফেলছিল না। জোনাকীর দিদিকে এমন একলা কোনদিনই পায়নি সে, এত কাছে দাঁড়িয়ে মানুষটার সঙ্গে কথাও বলেনি। বাড়িতে তৃতীয় প্রাণীটি নেই।

পরেশের বুকের ভিতর ঢুব ঢুব করছিল। যেন হঠাৎ তার মনে হল একটা বুনো লতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকীর গায়ের গন্ধের থেকে লাকীর গায়ের গন্ধও অন্যরকম, যেন অবিকল একটা

বুনো ফুলের গন্ধ পরেশের নাকে লাগছিল। বাস্তবিক, জোনাকী আজও এমন বেঁটে রয়ে গেছে! পরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'একটু চা খাবে?' আদুরে গলায় লাকী বলল।

'খেতে পারি, যদিও এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি।' পরেশ ফিক করে হাসল। 'আপনি করে দিলে নিশ্চয় খাব।'

'আহা, আমাকে আর আপনি কেন, আমি কি খুব একটা বুড়িয়ে গেছি?' লাকী হাসল না। 'জোনাকীর পনেরো, আমার উনিশ— মাঝখানে তো মোটে দুটো-চারটে বছর।'

'হুঁ, তা তো বটেই।' পরেশ একটা চোরা ঢোঁক গিলল। তার মনে হচ্ছিল জোনাকীর চেয়ে লাকীর গলার আওয়াজ অনেক বেশি সুন্দর, কেমন ভরাট, সুরেলা, চাকভাঙা গাঢ় মধুর কথা মনে পড়ল পরেশের। 'আমি আর একবার এসে ঘুরে গেছি কিন্তু! দেখলাম বাড়িতে কেউ নেই। অথচ ও আমায় কাল বার বার করে বলেছিল আজ সন্ধ্যার দিকে আসতে।'

'ও তো এমনই। হুট্ করে তোমায় কাল বলল, অথচ আজ ভুলে গেল।' তেমনি সুরেলা ভরাট গলায় লাকী উত্তর করল।

'এমন বিচ্ছিরি লাগে এক এক সময় ওর ব্যবহার!' মুখটা কালো করে ফেলল পরেশ। 'কখন বেরিয়েছে, কখন বা ফিরবে তাই বা কে জানে।'

'ফিরবে ঠিকই, তবে কখন ফিরবে বলা মুশকিল। তুমি বোসো, চট করে আমি চা-টা করে নিয়ে আসছি।'

জোনাকী শ্বাস ফেলতে পারছিল না। যেন কত দূর থেকে ছুটে এসেছে। তার বুকের মধ্যে দ্রুত হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছিল।

'কতক্ষণ এসেছ?'

'এই তো একটু আগে।'

'হুঁ, তা হবে কেন, মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে লাকীর সঙ্গে গল্প করছিলে।' আবছা অন্ধকারেও মনে হল জোনাকীর চোখ দুটো জ্বলছে।

'চা খেতে বলল, তাই একটু বসলাম—' পরেশ খুবই ভ্যাবাচাকা খেয়েছে। এভাবে ঘরে ঢুকেই জোনাকী, বলা নেই কওয়া নেই, তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে কাঠ-কয়লার খুপরিটার মধ্যে নিয়ে আসবে—পরেশের প্রায় চিন্তার বাইরে। যেন এর মধ্যেই জোনাকী কত কি সন্দেহ করছিল।

'তুমি কাল বললে, বাড়িতে থাকবে, তাই তো আমি এলাম, দেখলাম তুমি নেই। তোমার দিদি বসে আছে।'

'দিদি বসে আছে আর অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে দিদির গায়ের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে বসে তুমি গল্প জুড়ে দিলে! তোমাদের পুরুষ জাতটাই এমন!'

'গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসিনি তো!'

'থাক, আমার চোখে ধুলো দিতে হবে না।' জোনাকী চাপা ধমক লাগাল।

'আমার একটু দেরি হয়ে গেল ফিরতে, ভাবলাম তুমি নিশ্চয় অপেক্ষা করছ—কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ ধুমসীটা ঘরে ফিরবে কে জানত!'

'তোমার দিদিও বেরিয়েছিল বুঝি?'

'সেই দুপুরে ভাত খেয়েই বেরিয়েছিল ওর সুখেনের খোঁজে। সুখেনের সঙ্গে ওর তেমন একটা বনিবনা হচ্ছে না, বুঝেছ, আমি বেশ টের পাই, দুদিন ধরে সুখেন এখানে আসছে না, খুব ছটফট করছে লাকী।'

'তাই নাকি?' একটু অবাক হল পরেশ।

'তাই তো লাকীর কেবল আমাকে হিংসে আর মেজদিকে হিংসে, আমার কাছে তুমি ঘন ঘন আস, বংশীও মেজদির কাছে খুব আসছে—লাকীর এসব সহ্য হচ্ছে না।'

'সুখেন কি তোমার বড়দিকে পছন্দ করছে না ?'

'বলতে পারব না কী হয়েছে ওদের—তবে লাকী এখন খুব ছোঁক ছোঁক করছে, তোমাকে একলা পেয়ে খুব খাতির জমাতে চাইছিল, তাই না ?'

'না, তা নয়—বলছিল জোনাকীর আসতে যখন দেরি হচ্ছে, বসে একটু চা খাও।'

'খবরদার, কক্‌খনো ওর পাল্লায় পড়বে না, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আর শোন, ওদিকের ব্যবস্থা আমি ঠিক করে এসেছি।'

'সত্যি!' পরেশের চোখ বড় হয়ে গেল।

'হুঁ, এভাবে তো আমাদের চলবে না। আমাদের বেশ কিছু টাকার দরকার।'

'ওই বুড়োটাকে পটিয়েছি। কাল পাঁচশো দেবে, রাজী হয়েছে।'

'আর একটু বেশি রাজী করাতে পারলে না ?'

'দরকার কি বেশি চেয়ে—ভিক্ষে চাইতে কি খুব ভাল লাগে তুমি মনে কর ? তুমি বলছ পাঁচশোতেই যন্ত্রটা কেনা যাবে। ওটা যদি হাতে এসে যায়, টাকার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।'

'না, তা হবে না।' পরেশ একটা গরম নিশ্বাস ফেলল। 'আজও আমি সেই পার্টির সঙ্গে দেখা করেছি, সম্ভবত চারশো টাকার মধ্যে জিনিসটা পাওয়া যাবে—'

'বেশ, বাকি একশো টাকা আমাদের হাতে থেকে যাবে। জিনিসটা ভাল তো ? মানে, চালু আছে কিনা তুমি দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চমৎকার, আমেরিকান জিনিস।'

'তোমার হাত ঠিক আছে ?'

'তা না হলে আর এসব কাজে নামছি ?' একটু থেমে থেকে

পরেশ চাপা গলায় হাসল। 'খুব সম্ভব তোমার ওই বুড়ো প্রেমিক সারদা রক্ষিতের মাথাটাই আগে ফোঁপরা করব।'

'উঁহু,' অন্ধকারে জোনাকী মাথা ঝাঁকাল। 'খুন করার দরকার কি—আমাদের হাতে যখন অস্ত্রটা এসে যাচ্ছে, ভয় দেখিয়ে যা পারা যাবে আদায় করতে হবে। আমি সব খোঁজই নিয়েছি, শনিবার বিকেলে বুড়োর হাতে প্রায় লাখ টাকার মতন এসে যাবে, ঐ টাকা নিয়ে সোমবার ব্যাঙ্কে যাচ্ছে।'

'তোমায় বলল?'

'সেভাবে কি আর বলেছে—আমি কায়দা করে কথাটা ওর মুখ থেকে বের করেছি। আজ পাঁচশো টাকা চাইতেই বলল, কাল নিও। তখন আমরা গড়ের মাঠে। সেখানে থেকে যখন হাওয়া খেয়ে ফিরছি—বুড়ো আবার বলল, তবে শনিবার পর্যন্ত যদি অপেক্ষা কর আরো বেশি দিতে পারব, সেদিন লাখ টাকার ওপর আমার ঘরে থাকবে।'

'তারপর?' পরেশ একটা ঢোঁক গিলল।

'তখনি আমি বললাম, এত টাকা ঘরে রাখা কি ঠিক—যা দিনকাল, বুড়ো হেসে বলল, এমন লাখ-দুলাখ সব সময়ই আমার ঘরের ক্যাশ-বাক্সে মজুত থাকে—তবে হ্যাঁ, দিনকাল খারাপ, সোমবার সকালেই টাকাটা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখব।'

'বাঃ, অনেক খোঁজই তো নিয়ে এসেছ!' জোনাকীর পিঠে হাত রাখল পরেশ। 'ঠিক আছে, কাল তো যন্ত্রটা কেনা হয়ে যাক। কাল কখন বুড়ো টাকাটা দেবে বললে?'

'দুপুরে।'

পরেশ আর কথা বলল না। যেন শাখী বাড়িতে ঢুকেছে। একটু আগে বেড়ানো সেরে প্রকাশ চাটুজ্যে ফিরেছেন। গলার শব্দে টের পাওয়া গেল।

'বুঝলে,' জোনাকী চাপা গলায় হাসল, 'তুমি যখন সেদিন বললে

চার-পাঁচশ' টাকা হলেই একটি ছ'ঘড়ার রিভলবার যোগাড় করা যায়, তখন মনে মনে আমি ঠিক করে ফেললাম, ওটা আমাদের দরকার, কেননা একটা কিছু আমাদের করতে হবে। এভাবে বাপের ঘাড়ে ঝুলে থেকে চিরকাল পুঁইচচ্চড়ি খেয়ে আমি বাঁচতে পারব না। আর তুমিও চিরকাল দর্জির দোকানে ঘাড় গুঁজে সেলাই মেশিন চালাবে না—এভাবে বেঁচে থাকা আর না-থাকা সমান। আমাদের দুজনকে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে হবে।'

'অস্ত্রটা হাতে আসুক না। দেখবে কেমন চমৎকার একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকব আমরা, একটা বাড়ি কিনে ফেলব।'

'ফ্ল্যাট কেন, সারদা রক্ষিতের মতন চারতলা বাড়ি হাঁকাতে আমাদের বেশি দিন লাগবে না।'

শুনে অন্ধকারে খুশির চোটে পরেশ দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

'খবরদার!' আর একবার জোনাকী পরেশকে সাবধান করে দিল, 'আর কোনদিন লাকীর সঙ্গে কিন্তু কথা-টথা বলবে না।'

পরেশ ঘাড় কাত করল।

॥ সাত ॥

শাখীও প্রায় সেই স্বপ্ন দেখছিল। ভাল ফ্ল্যাট গাড়ি গয়না দামী শাড়ি। আজকাল কোন্ মেয়েই বা এসব স্বপ্ন না দেখে!

কিন্তু জোনাকীর মতন, পরেশের মতন, মানুষ খুন করে, ডাকাতি করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন সে দেখছিল না।

শাখী ঠিক করেছে, সিদ্ধার্থর টাকাটা কাল পেলেই বংশীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। চিরকাল কিছু বংশী ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়ে থাকুক শাখী চাইছে না। আর সে নিজে এভাবে এই টালির ঘরে ডাল আর পুঁইশাক খেয়ে বছরের পর বছর থাকতে পারছে না। অসহ্য লাগছে। এক এক সময় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দূরে কোথাও গিয়ে তারা একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে আপাতত থাকবে। দু হাজার টাকা তো কম না। অন্তত শাখী মনে মনে যেমন হিসাব করছিল, দু-একশো টাকা ট্রেন-ভাড়া ঘর-ভাড়া এবং অন্তত মাস দুয়েকের মতন খাওয়ার খরচ বাবদ রেখে বাকি সব টাকাটা দিয়েই তারা একটা দোকান করবে। কারবার ছাড়া এ দিনে কিছু হয় না। দেখতে দেখতে দোকানটা দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর তাদের পায় কে! হুঁ, তখন ফ্ল্যাট কেনা যাবে, গাড়ি কেনা যাবে, দামী শাড়ি গয়না পরা যাবে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের মনে খুব হাসছিল শাখী। সিদ্ধার্থর সঙ্গে বার্লিন যাবে না আরও কিছু! কোন্ দুঃখে সুজলা সুফলা বাংলাদেশ ছেড়ে চল্লিশ বছরের ঢেঁকিটার সঙ্গে সে জার্মানী পাড়ি দেবে? যা হোক, চট করে যে অর মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল! ফাঁকি দিয়ে, প্রায় কান মলে এই আধ-বুড়ো লোকটার কাছ থেকে দু হাজার টাকা সে আদায় করেছে। চারটিখানি কথা না!

শুনলে বংশীও খুশি হবে।

বংশী তো ক'দিন ধরে খুব চটাচটি করছিল। এত বাইরে বাইরে ঘোর কেন তুমি, কোথায় যাও, কার সঙ্গে যাও। এখন বংশী দেখুক, শাখী কি উদ্দেশ্য নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরছিল। আর কেনই বা চল্লিশ বছরের একটা বিয়ে-করা মানুষের সঙ্গে পীরিতের সম্পর্ক পেতেছিল।

জোনাকীও বাবার ঘরের মেঝেয় মাদুরের বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে হাসছিল।

হাসি ছিল না শুধু একজনের মুখে। মুখে হাসি ছিল না, চোখেও ঘুম ছিল না লাকীর। এই বাড়ির বড়মেয়ে। লাকী শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সুখেন কি দুশো টাকা দিতে পারবে? টাকাটা পেলেই সে কাল প্রণবকে একটা হাত-ঘড়ি কিনে দিত।

হুঁ, প্রণব। সুখেনটা কেমন বুড়িয়ে গেছে, তা ছাড়া গুড়-টুড় বেচে—এমন লোকের সঙ্গে চিরকাল কিন্তু লাকীর পোষাবে না। দু বছর আগে যেমন তেমন। এখন যেন সুখেনের সঙ্গে মিশতে তার রুচিতে বাধছে।

এই উমাশঙ্কর লেনের হলদে দুতলা বাড়ির ছেলেটাকে দেখবার পর থেকে তার মাথাটা যে খারাপ হয়ে গেছে এ-ও সত্য। তার কামনা বাসনা সাধ এখন সব ওইখানে বাঁধা পড়েছে। অনিদ্রা নিয়ে লাকী বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল।

॥ আট ॥

পরদিন গুনে গুনে কুড়িটা কড়কড়ে একশো টাকার নোট শাখীর হাতে তুলে দিল সিদ্ধার্থ।

আজ আর চৌরঙ্গীর সেই বারে যেতে হয়নি। যেন পৃথিবীতে কাউকে সে গ্রাহ্য করে না। শাখী দুপুরবেলা সিদ্ধার্থর অফিসে ঢুকে পড়েছিল। বেয়ারাকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে সকালের দিকেই টাকাটা তুলিয়ে এনে সিদ্ধার্থ অফিসের দেরাজে রেখে দিয়ে শাখীর জন্য অপেক্ষা করছিল।

শাখীকে দেখা মাত্র দেরাজ খুলে টাকাটা তার হাতে তুলে দিল। তখন লাঞ্চের সময়। ক্ষুধা পাওয়া সত্ত্বেও টাকাটার একটা ব্যবস্থা না করে সিদ্ধার্থ বেরোতে পারছিল না। বাইরে একটা হোটেলে সে লাঞ্চ খায়।

টাকা পেয়ে শাখীর মুখটা আহ্লাদে প্রায় ডিমের মতন লম্বা হয়ে গেল।

'খুশি হয়েছ?' সিদ্ধার্থ তার চোখ দুটো দেখছিল। আকাশের তারা হয়ে শাখীর দু চোখ জ্বলছিল তখন। সঙ্গে সঙ্গে শাখী ঘাড় কাত করেছিল।

'সাবধানে নিয়ে যাও।'

'আমার হাত-ব্যাগে থাকবে।' লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা তুলে দেখাল শাখী।

'ব্যাগটা চোখে চোখে রাখবে। আর শক্ত করে ধরে থাকবে। ট্রাম-বাসের ব্যাপার বড় বিচ্ছিরি।' সিদ্ধার্থ উপদেশ দিল।

যেন এত উপদেশ মাথা পেতে শোনার সময় নেই। কোনরকমে সিদ্ধার্থর অফিস থেকে বেরোতে পারলে শাখী বেঁচে যায়। এই জীবনে এই মানুষের সঙ্গে আর নয়।

বাপ্‌স্, কলকাতায় পোষাল না, কোথায় তাকে বার্লিন টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। হুঁ, বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে শাখীকে নিয়ে সুখের সংসার পাতা!

কিন্তু সেই সংসারে কত সুখ হবে শাখীর কি বুঝতে বাকি আছে?

সব জানা যায় না, মন্টির মা মন্টিকে নিয়ে কেন দিল্লী পড়ে আছে? হুঁ, সিদ্ধার্থর মেয়ে মন্টি—এখন বয়স এগারো-বারো বছর হবে। শাখী ক' বছর আগে মেয়েকে দেখেছে।

সব জানা যায় না, আবার কিছু কিছু জানাও গেছে। আসলে সিদ্ধার্থ মানুষটাই বদমেজাজী, ভীষণ রগচটা, পান থেকে চুন খস্‌তে পারে না। রাতদিন মন্টির মা-র সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করত, ক'দিনই নাকি ভদ্রমহিলাকে মারধোর করেছে, তা ছাড়া শোনা যায় একদিন নাকি অ্যাসিড ছুঁড়ে সিদ্ধার্থ ভদ্রমহিলার মুখটাই পুড়িয়ে দিতে গিয়েছিল। ভয়ে চিৎকার করে পাশের ফ্ল্যাটে ছুটে গিয়ে মন্টির মা সেই যাত্রা রক্ষা পায়।

না না, এই মানুষের বৌ হয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে না শাখী। তার চেয়ে বংশী ঢের ভাল ছেলে। রাগ নেই, কোন সময় মেজাজ খারাপ করে না, ভারি নরম স্বভাব। এই মানুষের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কোন মেয়েরই কষ্ট হয় না।

পুরুষের মেজাজ খারাপ থাকলে সেই মানুষকে নিয়ে ঘর-সংসার করার মতন বিড়ম্বনা কিছু আছে নাকি!

বাড়ি ফিরেই অবশ্য বংশীকে দেখবে এটা সে আশা করেনি। এই সময়টায় বংশীকে ট্যাক্সি নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। তবে বলা যায় না, যদি এদিকে কোথাও সওয়ার নিয়ে আসে, গাড়িটা রাস্তায় কোথাও পার্ক করে রেখে বংশী হুট্ করে শাখীর সঙ্গে দেখা করে যায়। এমন ক'দিনই হয়েছে।

এই জন্যই শাখীর মনে একটা ক্ষীণ আশাও ছিল, যদি ঘরে ফিরেই দেখে বংশী তার জন্য অপেক্ষা করছে!

কিন্তু ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশবাবু তার হাতে একটা ভাঁজ্-করা কাগজ তুলে দিলেন।

শাখীর চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। কাগজটার ওপর তার নাম লেখা। বংশীর হস্তাক্ষর। হাতের লেখাটা এত খারাপ এবং সেটা বাবা দেখেছেন, ভাঁজ-করা কাগজটা খুলে তিনি পড়েছেন কিনা শাখা অবশ্য বুঝল না, কিন্তু তা হলেও এমন বিশ্রী হস্তাক্ষর বাপের চোখে পড়েছে ভেবে শাখীর খুব লজ্জা করছিল।

অবশ্য তক্ষুণি নিজেকে বোঝাল, তাতে আর তেমন কি হয়েছে! বংশী কিছু বি-এ, এম-এ পাস করেনি—ট্যাক্সি চালায়, বাবা তো চোখেই দেখছে—এই ছেলের হাতের লেখা যে খুব একটা তাকিয়ে দেখার মত হবে না এ তো জানা কথা।

কিন্তু হঠাৎ আজ বংশী চিঠি লিখে রেখে গেল কেন? তাঁর বুক দুর দুর করছিল।

চিঠিটা নিয়ে সে নিজেদের ছোট ঘরে চলে এল। ব্যাগটা কোল থেকে নামাল না। ব্যাগের মধ্যে টাকা আছে তার খেয়াল ছিল।

ভাঁজ-করা কাগজটা খুলে শাখী একনিশ্বাসে সবটা পড়ল।

তার মন খারাপ হয়ে গেল।

এক বন্ধুর সঙ্গে বংশী দীঘা বেড়াতে যাচ্ছে। তিন-চার দিন সেখানে থাকবে। ফিরে এসে শাখীদের বাড়ি যাবে।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে শাখী ভাবল। বলা-কওয়া নেই—দীঘা? আর এমন বন্ধুটিই বা কে জুটল শাখী ভেবে পেল না।

কাল এতটা সময় এখানে কাটিয়ে গেল, একবারও তো কথাটা সে বলল না!

তবে কি বংশী সেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছে! হুঁ, দুদিন পর শাখীকে পাকা কথা দেবার কথা?

তাই বা হয় কী করে? শাখী আবার চিন্তা করল, বংশী নিজেই তো ক'দিন ধরে খুব ছটফট করছে, হাবে-ভাবে জানাচ্ছিল, এভাবে তার

ভাল লাগছে না—বিয়ে-টিয়ে করে শাখীকে নিয়ে ঘর না বাঁধা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছিল না, অবশ্য শাখীকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবার কথাটা বংশীর মাথায় তখনও যে আসেনি এটা শাখী বেশ বুঝতে পারছিল—কিন্তু শাখী এটা চাইছিল স্রেফ সিদ্ধার্থর জন্য, লোকটাকে এড়াবার জন্য দূরে না গিয়ে তার উপায় ছিল কি। হুঁ, বংশীকে সে কোথাও সরে পড়ার কথাই বলেছিল, ইতিমধ্যে টাকাটাও এসে যাবে' ধরে নিয়ে, পরে একসময় টাকার কথাও বলত। কেননা কোথাও চট করে দুজনের সরে পড়তে টাকা-পয়সার দরকার হবে যে।—কিন্তু হুট্ করে বংশীর দীঘায় বেড়াতে যাওয়া? মনে নানারকম সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। বংশীর চিঠিটা ভাঁজ করে শাখী তোষকের নিচে রাখল। ব্যাগটা তার পুরনো ছোট ফাইবারের সুটকেসটার মধ্যে ঢুকিয়ে কাপড়-চোপড়ের ভাঁজের মধ্যে গুঁজে রাখল। তালা নেই। তা হলেও আপাতত ব্যাগটা লুকিয়ে রাখা গেল। এই সুটকেস লাকী কোনদিনই ধরে না। তালা-টালা নেই বলে, তা ছাড়া সুটকেসের ডালার কব্জা-টব্জা নড়বড়ে হয়ে গেছে বলে লাকীর মনে কোনদিনই সন্দেহ হয় না এর মধ্যে শাখী মূল্যবান কোনো কিছু রাখে।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে শাখী মুখ-হাত ধুতে কলতলায় চলে গেল।

পরেশ যেটা সহ্য করতে পারছে, বংশী সেটা সহ্য করতে পারবে তার কি কথা আছে?

খুব ঘোরাঘুরি করছে শাখী, ভিতরে একটা অশান্তি নিয়ে বংশী আসলে ক'দিন থেকে খুব ভুগছিল।

কিন্তু লোকটা কে, বংশী ঠিক বুঝতে পারছিল না। এ পাড়ার সারদা রক্ষিতের মতন একটা টাকা-পয়সাওয়ালা বুড়োর সঙ্গে জোনাকীর ব্যাপারটাকে পরেশ কিছুই মনে করত না। বরং জোনাকী

যদি কিছু আদায় করে আনতে পারে, পরেশ মনে মনে চাইছিল। কিন্তু বংশী যদি জানত যে, ঠিক এই উমাশঙ্কর লেনের আর একটা বড়-লোক, যার বৌ আছে, বারো বছরের মেয়ে আছে, সেই সিদ্ধার্থর সঙ্গে শাখী ঘোরাঘুরি করছে, বংশী ক্ষেপে যেত। কিছুতেই জিনিসটা সহ্য করতে পারত না।

ট্যাক্সি নিয়ে কলকাতা শহরের কোথায় না বংশী ছুটোছুটি করে। কিন্তু একদিন সে চোখে দেখল না সিদ্ধার্থর গাড়িতে করে শাখী ঘুরছে। কি নিরিবিলি কোথাও বসে দুজনে গল্প করছে।

সেদিন অফিস-পাড়া দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ শাখীর মতন একটি মেয়েকে একটা অফিসে ঢুকতে দেখে বংশী ভীষণ চমকে উঠেছিল। সওয়ার ছিল না, কাজেই মিনিট দশ গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে বংশী অপেক্ষা করছিল, যদি মেয়েটি আবার বেরিয়ে আসে ভাল করে দেখবে সত্যি শাখী কিনা কিন্তু ইতিমধ্যে আর একজন তার ট্যাক্সি ভাড়া করে চেপে বসতে বংশীর আর ঐ অফিসটার সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করা হল না। ভীষণ ছটফট করছিল তার মন। ভদ্রলোককে তার ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিয়েই বংশী তখনই শাখীদের বাড়িতে ছুটে আসে। তখন লাকী ঘরে। জোনাকীও নেই। শাখীও নেই।

'শাখী কোথায় বেরিয়েছে?' বংশী প্রশ্ন করতে লাকী হেসে ফেলেছিল।

'ও কি ঘরে থাকে, সব সময় বাইরে বাইরে ঘুর ঘুর করছে যে।'

'কোথায় ঘোরে এত?' বংশীর মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল।

'ঠিক বলতে পারব না, তবে একদিন শাখী একটা দামী গাড়ীতে বসে কোথাও যাচ্ছে, আমি দেখেছি, আমি তখন সুখেনের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছিলাম।'

প্রায় পুরো এক মিনিট চুপ থেকে বংশী বলল, 'আজ যেন একটু আগে ডালহৌসীর একটা অফিসে ওকে ঢুকতে দেখলাম।'

'আশ্চর্য কি !' লাকী গম্ভীর হয়ে বলেছিল। 'হয়তো যার সঙ্গে ঘোরে শাখী সেই অফিসের কোনো বাবু টাবু হবে।'

বংশীর মাথাটা তখন ঘুরছিল।

'একটু চা খাবে ?' লাকী কেমন করে যেন হাসছিল।

'না।' বংশী মাথা নেড়েছিল, সে তো আর পরেশ নয় যে, জোনাকী কারো সঙ্গে পীরিত করে বেড়াচ্ছে শুনেও জিনিসটা গায়ে মাখবে না, লাকীর সঙ্গে বসে চা খাবে গল্প করবে। বংশী সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিটাকে সুযোগ মতন একটা জায়গায় পার্ক করে রেখে ধারে-কাছে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। পকেটে ছোট একটা নোটবই ছিল, কলমও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে নোটবই থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খচ খচ করে শাখীকে দু কলম চিঠি লিখে ফেলল। ক'দিনের জন্য সে দীঘা বেড়াতে যাচ্ছে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে চিঠিটা নিয়ে তখনি আবার সে প্রকাশবাবুর বাড়ির দিকে ছুটল। ভিতরে যেতে হল না। প্রকাশ চাটুজ্যে সদরে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবেন বলে নাপিত খুঁজছিলেন। বুড়োর হাতে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে মাতালের মতন টলতে টলতে বংশী চলে আসে।

॥ নয় ॥

কলতলা থেকে ফিরে এসে শাখী দেখল দরজার কাছে সুখেন দাঁড়িয়ে। লাকীর লাভার গুড়ের কারবারী সুখেন। মুখটা বড় শুকনো। দেখলে মায়া লাগে। শাখী এক পলকা হাসল।

'এসো, বাইরে কেন ?'

কথা না বলে সুখেন ঘরে ঢুকল।

'লাকী কোথায় ?'

'কি জানি, শুনলাম দুপুরে কোথায় বেরিয়েছে। লাকী বাড়ি নেই, জোনাকীও বাড়ি নেই। বাবা বড় ঘরে ঘুমোচ্ছে।' অর্থাৎ শাখী সুখেনকে বুঝিয়ে দিল বাড়ি এখন একদম ফাঁকা। বড়বোনের প্রেমিক হয়েও তোমার যদি ইচ্ছে করে, মেজবোনের সঙ্গে এক-আধটু প্রেম-টেম করতে পার বাছা।

'বসো, দাঁড়িয়ে কেন।' জলচৌকিটা সুখেনের দিকে এগিয়ে দিল শাখী। তখন স্নান করা হয়নি। তাড়াতাড়ি সিদ্ধার্থর সঙ্গে তার অফিসে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এখন মাথায় একটু জল দিয়ে এসেছে। রোদে-রোদে ঘুরে মুখটা গোলাপের মতন টকটক করছে। বেণীটা খুলে ফেলে শাখী চুলে চিরুনি চালাতে লাগল। হাঁ করে সুখেন দেখছিল। একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে বলল 'ভাবছিলাম লাকীর দেখা পাব।'

'ও কি বাড়ি-টাড়ি থাকে—বাইরে বাইরে সারাদিনই ঘুর ঘুর করছে।' শাখী ঘুরে দাঁড়িয়ে আরশির মধ্য মুখখানা দেখছিল। এদিকে চোখ না ঘুরিয়ে সুখেনের কথার উত্তর দিল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সুখেন মাথা নাড়ল।

'বুঝেছি, আজ বেশ বুঝতে পারছি, লাকীর মন ক'দিন থেকে উড়ু উড়ু করছে, আমাকে আর ভাল লাগে না—অন্য কোথাও ওর মন ঝুঁকেছে—'

শাখী চট করে এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'তবে তোমাকে একটা কথা বলছি', চোখের তারা দুটো চরকির মতন সুন্দর করে ঘুরিয়ে মুচকি হেসে শাখী বলল, 'আমার বড়বোন—ওর সম্পর্কে বেশি কিছু বলা আমার শোভা পায় না। তা হলেও তোমাকে ক'বছর দেখছি—একটা মায়া বসে গেছে—এই উমাশঙ্কর লেনের একটা হলদে দোতলা বাড়ির ছোঁড়ার সঙ্গে লাকী লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে।'

'অ্যাঁ!' সুখেন এতক্ষণ পর ধপ করে জলচৌকিটার ওপর বসে পড়ল। 'আর, কাল, বুঝতে পারছ, আমাকে জব্দ করার জন্য দোকানে গিয়ে বলল এখনি তিনশো টাকা চাই আমার, অথচ ওকে বুঝিয়ে বললাম আমাদের গুড়ের নৌকো ইছামতীর জলে ডুবে গিয়ে দারুণ লোকসান হয়ে গেছে।'

সুখেনের চোখে চোখ রেখে অবাক হওয়ার মতন চেহারা করে শাখী বলল, 'এতবড় একটা লোকসান হয়েছে তোমাদের জেনেও লাকী তোমার কাছে টাকা চাইছিল?'

'হুঁ', মুখটা কাঁদ-কাঁদ করে ফেলল সুখেন।

'টাকাটা কি যোগাড় করতে পেরেছ?'

'না।' সুখেন মাথা নাড়ল। 'তাই ওকে এখন জানাতে এসে-ছিলাম যাতে আরো দুটো দিন ও আমাকে সময় দেয়।'

'কক্ষনো ওকে টাকা দেবে না—ও কি মনে কর এই তিনশো টাকা পেলে আমাদের সংসারে দিত? বাবার হাতে দিত? মোটেই না।'

'কি করত তাহলে এতগুলো টাকা পেয়ে?'

'ফুর্তি করত, ওই দোতলা বাড়ির ছোঁড়াটাকে নিয়ে বেড়াতে যেত,

সিনেমা-থিয়েটার দেখত, হোটেল-রেস্টুরেণ্টে খেত। হয়তো ছোঁড়ার জামাটা জুতোটা কিনে দিত।'

'বটে! আমার টাকা দিয়ে আর এক প্রেমিককে খুশি করা—' সুখেনের মুখটা কেমন. বীভৎস হয়ে উঠল। 'আচ্ছা, আমিও দেখে নেব—আমার নাম সুখেন।' বলতে বলতে সুখেন উঠে দাঁড়াল।

'এক্ষুনি যাচ্ছ? একটু চা টা খাবে না?'

'নাঃ।' সুখেন মাথা ঝাঁকাল। তারপর মাথার ওপর টালির চালটার দিকে চোখ রেখে কেমন একটা যেন গুম হয়ে রইল।

'লাকী এলে কিছু বলব?'

'নাঃ।' চৌকাঠের কাছে সরে গিয়ে সুখেন ঘুরে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, ওই যে ছোঁড়ার কথা বললে, তোমাদের এদিকে থাকে—কোন্ বাড়িতে থাকে আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পার?'

'কেন পারব না!' তখনও শাথীর হাতে চিরুনিটা ধরা। 'এসো, এদিকে এসো।'

শাথীর কথামতন সুখেন তাদের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

'ওই যে হলদে বাড়ি', জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে চিরুনিটা বাড়িয়ে দিয়ে শাথী সুখেনকে হলদে বাড়িটা চিনিয়ে দিল।

ফ্যাল ফ্যাল করে কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে সুখেন শাথীদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে আর একবার হলদে বাড়িটা দেখল। তারপর ধীরে ধীরে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে চলে গেল।

শাথীর তখনও চুল বাঁধা হয়নি। নিজের মনে মুচকি হাসছিল সে। বংশী এখানে এলেই লাকীর চক্ষে আগুন জ্বলে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদের দুজনকে দেখে। এত হিংসা যার মনে, তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া ভাল। ভাবল সে। লাকীর মন যে অন্য দিকে উড়ু উড়ু করছে, সুখেনকে জানিয়ে দিয়ে শাথীর ভীষণ ভাল লাগছিল।

কিন্তু আবার অশান্তিও ছিল তার নিজের মনে। ঠিক এই সময়টায় বংশী দীঘা বেড়াতে গেল কেন? এতগুলি টাকা এনে ফাইবারের সুটকেসটায় লুকিয়ে রেখেছে। বংশী ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও তারা দুজনে সরতে পারছে না। অথচ এভাবে টাকাটাই বা সে ক'দিন ঘরে রাখবে? দশ পাঁচ টাকা না। দু-হা-জা-র টাকা। তালা ভাঙা ফাইবারের সুটকেসটার দিকে চোখ রেখে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অবশ্য পরমুহূর্তে আহ্লাদে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

॥ দশ ॥

জোনাকী ভারি খুশি। পরেশ অস্ত্রটা যোগাড় করতে পেরেছে। ছ' ঘড়ার রিভলবার। জোনাকী হাতে নিয়েছে। কেমন চক চক করছিল।

একটা চায়ের দোকানের পর্দা-ঘেরা কামরায় বসে দুজনে ফিসফিস করে কথা বলছিল। সেখানেই জামার নিচে থেকে বের করে পরেশ জোনাকীকে জিনিসটা দেখিয়েছে।

একটুখানি দেখেই জোনাকী সেটা পরেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। পরেশও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটা জামার নিচে ঢুকিয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ব্যস্, বাইরে থেকে, ওপর থেকে, আর কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর চা খেতে খেতে দুজনে শনিবার বিকেলের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছিল।

ঠিক তখন আর একটা চায়ের দোকানের পর্দা-ঘেরা কামরায় বসে কপালের রগ দুটো দু আঙুলে টিপে ধরে বংশী আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

উঁহু, দীঘায় যায়নি সে। শাখীকে মিথ্যা কথা বলে এই কলকাতা শহরে সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। পরশু বিকেল থেকে প্রকাশ চাটুজ্যের বাড়ির আশে-পাশে লুকিয়ে থেকে লক্ষ্য করেছে শাখী কোথায় যায়, কার সঙ্গে বেরোয়, কখন বাড়ি ফেরে।

দুদিন তার চোখের ঘুম পেটের ক্ষুধা উবে গেছে। আক্রোশে রাগে সে দাঁতে দাঁত ঘষছে। হুঁ, এই জন্যে কি শাখী তাকে বলেছিল, চল দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই! তার মানে, খুব যে একটা বংশীর

জন্য ভিতরটা ছটফট করছে তাই বোঝাতে চেয়েছিল মেয়ে। আর বলেছিল কিনা দুদিন পরেই যাতে বংশী উত্তর দেয়।

উত্তর দেবে না আরো কিছু! তোমার মতন একটা বাজে মেয়েকে বিয়ে করার চেয়ে একটা রাস্তার ভিখিরি মেয়েকে বিয়ে করলেও বেশি সুখ-শান্তি।

বংশীর মতন আর একজনেরও চোখ দুটো আক্রোশে রাগে থেকে থেকে জ্বলছিল।

চায়ের দোকানে বসে নেই এই মানুষ। রাস্তায় ঘুরছে। লাকীকে খুঁজছে। আজও বিকেলে লাকীকে গিয়ে বাড়িতে পায়নি সুখেন। হলদে বাড়িটা দেখেছে সে। কিন্তু বাড়ির সেই ছেলেটাকে দেখেনি। লাকী যার সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছে। যার নাম প্রণব। সবে গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে। চোখ দুটো স্বপ্ন-ভরা।

না, সুখেন জানে না, উমাশঙ্কর লেনের ধারে-কাছেও তারা দুজন এখন নেই। সেই কোথায় তালতলার কাছে একটা অপরিচিত চায়ের দোকানে পর্দা-ঘেরা কামরায় বসে দুটিতে চা-চপ খাচ্ছে আর গল্প করছে।

'আমি অবিশ্যি তোমাকে এখনি বিয়ে করতে পারব না। আমার ওপরে দু দাদা আছে, একটা বোন আছে—তা হলেও লুকিয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে পারব।'

'আমিও তাই চাইছি—যাক বছর দু তিন। দাদাদের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাক, তুমিও একটা দুটো পাস দিয়ে চাকরি-টাকরি জুটিয়ে নাও—তখন দেখা যাবে।' লাকী বুঝিয়েছিল।

'এই নাও, পঞ্চাশটা টাকা এনেছি তোমার জন্য।'

'কোথায় টাকা পেলে?' লাকীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল।

'চুরি করেছি।'

'বাবার বাক্স থেকে বুঝি ?'

'হুঁ, তুমি একখানা ভাল শাড়ি কিনবে।'

লাকী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। একেই তো বলে ভালবাসা। আর গুড়ের কারবার আছে নিজের—দোকানের ক্যাশ-ট্যাশ সব তার কাছে থাকে—সেই সুখেন কিনা আজ পর্যন্ত দশটা টাকাও লাকীর হাতে দিল না! পরশু কি কম দুঃখ পেয়ে সে নতুনবাজার ছুটে গিয়েছিল! হুঁ, আড়াইশো টাকা দাও, নয়তো এই জীবনে তুমি উমাশঙ্কর লেনের দিকে আর পা বাড়াবে না। খুব কড়া করে বলে এসেছে লাকী। আশ্চর্য, পুরো দুটো দিন পার হতে চলল—একবার লোকটা এদিকে উঁকিই দিল না! ছোটলোক আর কাকে বলে! দুশো আড়াইশো টাকা তার বাক্সে থাকে না একথা বিশ্বাস করবে কেউ ? তার চেয়ে ইস্কুলে পড়ে, সতেরো বছরের এই প্রণবই অনেক ভাল। বাবার বাক্স থেকে তার জন্য টাকা চুরি করে এনেছে। বোঝা যায় লাকীর জন্য কত তার মনের টান! ভালবাসা জিনিসটাকে সে কত বড় করে দেখছে!

॥ এগারো ॥

শনিবার সকালে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে এমন তেজালো রোদ উঠল, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এমন অসহ্য গরম আরম্ভ হল, যেন প্রাণ বাঁচে না।

প্রকাশবাবু মধ্যাহ্ন-আহার সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মাঝে মাঝে তাই করেন তিনি। কেবল সকালে সন্ধ্যায় ভ্রমণ না, দুপুরের রোদেও বেড়াতে বেরোন। রাস্তায় কোন গাছতলায় কি কোন পার্কে ঢুকে গাছের ছায়ায় বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানে কলকাতা শহরের একটা পার্কে বা মাঠের ধারে যতটা প্রকৃতি চোখে দেখা যায়, উপভোগ করেন।

প্রকাশবাবু বেরিয়ে পড়তে লাকীও বেরোবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। প্রণবের টাকা পেয়ে কাল বিকেলে একটা শাড়ি কিনে ফেলেছে। রংটা চমৎকার।

প্রকাশবাবু এখনও সেটা দেখেননি। দেখলেও কিছু বলবেন না লাকী জানে। তিনি মনে করবেন সুখেনই হয়তো দিয়েছে কাপড়টা।

মানে, প্রকাশবাবু যতক্ষণ বাড়িতে ছিলেন, শাড়িটা সে পরেনি। এখন পরল। শাখী দেখল, জোনাকীও দেখল, বড়দির পরনে নতুন শাড়ি। দেখে দু বোন চোখ-টেপাটেপি করল।

তারা জানে কে এই শাড়ি কিনে দিয়েছে।

বোনেরা চোখ-টেপাটেপি করছে কি আড়ালে ফিস ফিস গুজ গুজ করে একথা-সেকথা বলাবলি করছে টের পেয়েও এই নিয়ে লাকী মোটেই মাথা ঘামাল না।

বরং ওদের চোখের সামনে এমন একটা জমকালো শাড়ি পরতে পেয়ে ভয়ানক গর্ব হচ্ছিল তার।

পঞ্চাশ টাকার সবটাই কিন্তু শাড়ির পিছনে খরচ করে ফেলেনি লাকী। শাড়ির দাম মোটে ত্রিশ টাকা। ক্রিম স্নো পাউডার ও একটা মাথার তেলও কিনেছিল লাকী। এবং যে টাকাটা হাতে রয়ে গেছে তাই দিয়ে প্রণবকে নিয়ে অন্তত দু'দিন সিনেমা দেখা ও রেস্টুরেণ্টে খাওয়া চলবে হিসাব করে দেখেছে সে।

যাই হোক, নতুন শাড়ি পরে এবং মুখটাকে স্নো-পাউডার মাখিয়ে একেবারে সাদা করে ফেলে লাকী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বলতে কি, যখন বেরোয়, লাকীর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সুখেন যদি একবার আসত।

উঁহু, সুখেনকে দেখতে তার প্রাণ আইঢাই করছে না, সে চাইছিল সুখেন তার পরনের জমকালো শাড়িটা একবার দেখুক, দেখে জ্বলে-পুড়ে মরুক।

তুমি নিজে কারবারী মানুষ হাত দিয়ে একটা পয়সা গলে না, অথচ প্রেম করার ষোল আনা শখ আছে—আর ওই এক ছোঁড়া ইস্কুলে পড়ে, বাবার বাক্স থেকে চুরি করে টাকা এনে লাকীর শাড়ি কিনে দিয়েছে।

কাজেই সুখেন, তোমার ভালবাসায় আমি থুতু ছিটোই। যেন সামনে পেলে সুখেনকে লাকী কথাটা শুনিয়ে দিত।

হুঁ, লাকী বেরিয়ে গেল। কিন্তু লাকীকে নিয়ে জোনাকীর সাথে বসে বেশিক্ষণ হাসাহাসি করা শাখীর হয় না। তার মনে অশান্তি। তিনদিন বংশীর দেখা নেই। আজ সে ঠিক করেছে নারকেলডাঙার গ্যারেজে, অর্থাৎ যেখানে বংশীর ট্যাক্সিটা থাকে সেখানে একবার খোঁজ করবে বংশী ফিরল কিনা। যদি সেখানে কোনরকম খবর না পায়, তবে অগত্যা তাকে সেই তিলজলায় বংশীর বাড়িতে যেতে হবে। একদিন বংশীর ট্যাক্সিতে চেপে সে তিলজলা ঘুরে এসেছে। ভীষণ

বাজে রাস্তা। এখন অবশ্য সেখানে যেতে হলে শাখীকে বাস ধরতে হবে। তাই তো, কত নম্বর বাস শাখীর জানা নেই। অবশ্য রাস্তায় বেরিয়ে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে বাসের নম্বরটা জেনে নিতে পারবে। আপাতত নারকেলডাঙায় তো খোঁজটা নেওয়া যাক।

শাখী বেরিয়ে যেতে জোনাকী ছুট্ করে দিদিদের ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ল। এমনি। এতক্ষণ, অর্থাৎ যতক্ষণ লাকী সাজগোজ করছিল, শাখী ও জোনাকী বড় ঘরে, অর্থাৎ প্রকাশবাবুর ঘরে বসে লাকীকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। বলা হয়েছে, ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে উঠে প্রকাশবাবু রোদ মাথায় নিয়েই পার্কের দিকে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছেন।

. শাখীদের ছোট ঘরটায় এলেই জোনাকী যা তার স্বভাব, এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে, এই ঘরটা বড় একটা ফাঁকা পায় না সে, হয় শাখী না হয় লাকী—একজন না একজন থাকবেই! তাদের প্রেমিকের সঙ্গেই কথা বলুক কি একা বসে আরশিতে মুখ দেখুক-তা ছাড়া জানালা? বড় ঘরের মতন এই ঘরের জানালায় দাঁড়ালেও সামনের রাস্তাটা দেখা যায়। তুজনেরই যখন ডবল করে পীরিতের মানুষ জুটে গেছে—জানালাটা এক একজনের পক্ষে সাংঘাতিক দরকারী জিনিস যে,—কখন বংশী আসছে আর কখন সিদ্ধার্থবাবু ওদিকের লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে, জানালায় না দাঁড়ালে শাখী বুঝবে কেমন করে, লাকীই বা কেমন করে জানবে যে, এখন তার সুখেন আসছে কি হলদে রংয়ের দোতলা বাড়ির প্রণব ছোঁড়া মোড়ের ওই সিগারেটের দোকানটার সামনে তীর্থের কাক হয়ে বুড়ি প্রেমিকাটির জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

জোনাকী হঠাৎ নিজের মনে হাসল।

একদিক থেকে লাকীর সঙ্গে তার নিজের যেন অনেকটা মিল আছে। যেমন সুখেন ছাড়াও লাকীর একটা ছোকরা প্রেমিক জুটে গেছে, তেমনি পরেশ ছাড়াও জোনাকীর এক বুড়ো প্রেমিক জুটে

গেছে। অর্থাৎ, প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে বয়সের আকাশ-পাতাল তফাত। হুঁ, তা ছাড়া লাকীর তুলনায় ঐ প্রণব ছোঁড়া কত ছোট। এদিক থেকে শাখা অনেকটা ভাগ্যবতী বলা যায়। কেননা তার বংশী তো আছেই, সিদ্ধার্থও খুব একটা বুড়ো হয়নি।

এসব ভাবছিল জোনাকী, আর দিদিদের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছিল। ছোট টেবিলটায় লাকীর হুটো ভাঙা চুলের কাঁটা ক'দিন থেকে পড়ে আছে। টেবিলের আর একদিকে শাখীর গলার সেই কাঁচের মালাটা পড়ে আছে। এখন আর শাখী সেটা গলায় পরে না। মালাটা ছিঁড়ে অনেক কাঁচ-টাচ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

টেবিল ছেড়ে জোনাকী শাখীদের বিছানার কাছে চলে এল। ছেঁড়া তোষকের কোণাটা তুলতেই একটা চিঠি তার চোখে পড়ল। চট করে সেটা হাতে নিয়ে দেখল শাখীর নামে চিঠি। যেন বংশীর হাতের লেখা। চিঠিটা পড়তে পড়তে জোনাকীর খুব হাসি পেল। এই জন্যই শাখীর মুখটা হুদিন ধরে ভার ভার। বংশী দীঘা বেড়াতে গেছে। ভাঁজ করে, যেমন ছিল, চিঠিটা তোষকের নিচে রেখে দিয়ে জোনাকী কোণার জঞ্জালগুলোর কাছে চলে গেল। ছেঁড়া নেকড়া-বোঝাই তালা-ভাঙা ফাইবারের স্যুটকেসটা। দেখে জোনাকীর খিল খিল হাসি পাচ্ছিল। বংশী কি আজ পর্যন্ত শাখীকে একটা বাক্স-পেঁটরা কিনে দিতে পারল না! এত বড়লোক সিদ্ধার্থই বা কি করছে?

আসল কথা, শাখী আদায় করতে জানে না। কেবল পীরিত করেই সুখ পায়, পীরিতির মানুষদের কাছ থেকে এটা-ওটা চেয়ে নেবার মতন বুদ্ধি শাখীর নেই। বুদ্ধিও নেই, মুখও নেই। লাকী কেমন চমৎকার একটা শাড়ি আদায় করল প্রণব ছোঁড়ার কাছ থেকে। হয়তো বাপের বাক্স ভেঙে ছোঁড়া বুড়ি প্রেমিকার শাড়ির টাকা যোগাড় করেছিল। বলা যায় না আজকালকার ছোঁড়াদের বিষয়ে

কিছু। এদিক থেকে জোনাকী সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবতা। কেমন কান মলে বুড়ো সারদা রক্ষিতের কাছ থেকে, পাঁচ দশ টাকা না— পাঁচশো টাকা আদায় করল।

পরেশের কথা মনে পড়তে জোনাকীর মুখে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল।

এখন ক'টা বাজে? ছুটো? তিনটে? তিনটে বাজলে কলে জল আসত। কাজেই তিনটে বাজতে দেরি আছে। তা হলেও ইতিমধ্যে পরেশের এসে পড়া উচিত ছিল। এই সময়টায় সারদা রক্ষিতের বাড়ির সামনের দিককার গলিটা বেশ একটু ফাঁকা থাকে। সারদা রক্ষিত ঘরে বসে কফি খায়।

আজ বুড়োর ঘরে লাখ টাকার ওপর এসে জমা হয়ে আছে।

উঁহু, জোনাকী চারতলায় উঠত না, আঙুল দিয়ে সারদা রক্ষিতের ঘরটা নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দেবে। কোমরে ছ' ঘড়ার রিভলবার গুঁজে পরেশ তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাবে। জোনাকী নিচে দাঁড়িয়ে সিঁড়িটা পাহারা দেবে। ক' মিনিটের কাজ! চেঁচিয়ে কিছু চাইতে হবে না, গুলি ছুঁড়তে হবে না। এমন একটা অস্ত্র হাতে দেখলেই বাপ বাপ করে দেরাজের চাবিটা বার করে দেবে। তা না হলে আর একটা পিস্তল দেখিয়ে কতলোক কত কিছু কাজ হাসিল করছে? একলা ঘরে একটা ছোরা দেখালেও একটা মানুষ ভয় পেয়ে চাবি বা টাকাকড়ি বার করে দিতে এক সেকেণ্ড দেরি করবে না।

জোনাকী চমকে উঠল। পায়ের শব্দ। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে তার চোখ ছুটো গোল হয়ে উঠল। পরেশ।

'কি ব্যাপার?' জোনাকী ফিসফিসিয়ে উঠল।

পরেশ আস্তে মাথা নাড়ল।

'হল না।'

'কেন?' জোনাকী মোটেই খুশি হল না।

'সব ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে।'

'ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে মানে?' এবার জোনাকী ভুরু কুঁচকালো। 'তুমি কি একা একা সারদা রক্ষিতের চারতলায় উঠতে গিয়েছিলে?'

'আরে না, তা কেন যাব।' তোমাকে ছাড়া দারোয়ান আমাকে উঠতে দেবে কেন? আজ সকাল থেকে বাড়ি থেকে আমাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।'

'কেন?'

'পুলিস টের পেয়ে গেছে আমার কাছে একটা রিভলবার আছে।'

'অ্যাঁ!' জোনাকীর মুখটা সাদা হয়ে গেল। 'অস্ত্রটা কোথায় রেখেছ তা হলে?'

'কোথায় আবার রাখব, সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। বাড়িতে রাখলে বিপদ হবে যে—কখন এসে ঘেরাও করে খানাতল্লাসী চালায় ঠিক কি।'

'হুট্ করে পুলিস কি করে জেনে গেল যে তোমার কাছে অস্ত্রটা আছে?'

'কি করে বলি বল, কলকাতা শহরে এসব জিনিসের কেনা-বেচা যেমন বেড়েছে, তেমনি টিকটিকিরাও চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে। হয়তো যার কাছ থেকে কিনেছি সেই হারামজাদাই পুলিসকে খবর দিয়েছে, বা—'

'থাক, এত সব কথার দরকার নেই—বললে সঙ্গে এনেছ, কোথায় দেখি?'

জামা তুলে কোমর থেকে পরেশ রিভলবারটা টেনে বের করল।

'ভাবলাম তুমি মেয়েছেলে, তোমাকে পুলিস সন্দেহ করবে না, তাছাড়া তোমাদের বাড়িতে ছেলে-ছোকরা নেই, এখন দু একটা দিন তোমার কাছে জিনিসটা লুকিয়ে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

হাত বাড়িয়ে জোনাকী রিভলবারটা নিল।

'সাবধানে নাড়াচাড়া করবে, গুলি ভরা আছে।'

পরেশের চোখের দিকে তাকাল না জোনাকী। চোখের সামনে ঝকঝকে অস্ত্রটা তুলে এক পলক দেখল।

'কোথায় রাখবে? তোমাদের ঐ কাঠ-কয়লার ঘরটায়?'

'তোমার যেমন বুদ্ধি! যখন-তখন ওখানে ঢুকে লাকী ঘুঁটে আনছে কয়লা আনছে!'

'তবে কি তোমার বাক্সে-টাক্সে—'

'তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।' চাপা ধমক লাগাল জোনাকী, 'আমার বাক্স বাবার ঘরে। ওখানে এটা আমি রাখতে চাই না।'

পরেশ চুপ করে রইল। জোনাকী আস্তে আস্তে কোণের দিকে, যেখানে মাকড়সার জাল ও নানারকম জঞ্জাল-টঞ্জাল জমে আছে, শাখীর তালা-ভাঙা ফাইবারের স্যুটকেসটা রয়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁ-হাতে আলগোছে ডালাটা তুলে ধরে শাখীর পুরনো ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ের ভিতর রিভলবার সহ ডানহাতটা ঢুকিয়ে দিল জোনাকী, কিন্তু যখন হাতটা বাক্সের ভিতর থেকে তুলে আনল, দেখা গেল তার মুঠোর মধ্যে একটা মোটা খাম।

'কি আছে ওটার মধ্যে?' পরেশ শব্দ না করে হাসছিল।

জোনাকী কথা বলছিল না, যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে, পরেশের কাছে সরে এসে খামটা খুলল।

পরেশ এবং জোনাকীর চোখের তারা কপালে উঠল।

'কত টাকা?' পরেশ ফিসফিসিয়ে উঠল।

'গুনে ছাখো।' নোটের বাণ্ডিলটা পরেশের হাতে তুলে দিল জোনাকী। জোনাকীর বুকের মধ্যে ছুর ছুর শুরু হচ্ছিল। পরেশ নোটগুলো গুনতে আরম্ভ করতে জোনাকী বাধা দিল।

'এখানে না।'

'তোমাদের ওই কাঠ-কয়লার অন্ধকার খুপরিটার মধ্যে চল।'

জোনাকী দোরটা ভেজিয়ে রেখে পরেশকে নিয়ে পাশের কাঠ-কয়লার খুপরির মধ্যে এসে ঢুকল।

এগারো

দুপদাপ করে দুজনে ঘরে ঢুকল। আগে শাখী, পিছনে বংশী। নারকেলডাঙার গ্যারেজ পর্যন্ত ছুটে যেতে হয়নি শাখীকে। এই তো বড়রাস্তার ওপর সিনেমা-হলটার সামনেই বংশী একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছিল। দেখতে পেয়ে শাখী ভীষণ চমকে উঠেছিল।

'তুমি এখানে?' শাখী প্রশ্ন করেছিল।

'হুঁ, সিনেমা দেখতে এসেছিলাম।' বংশী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল।

'সিনেমা দেখতে!' শাখীর চোখের পলক পড়ছিল না। বংশীর মুখটা দেখছিল। 'তুমি না দীঘা গিয়েছিলে?'

হেসে বংশী মাথা নেড়েছিল।

'কাল বাড়ি ফিরেছি।'

'কাল রাত্তিরে?' শাখী কি কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল? 'আমার সঙ্গে দেখা করলে না, অথচ এ-পাড়ায় এসেছ সিনেমা দেখতে!'

'ভেবেছিলাম সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার সময় তোমার কাছে একবার যাব!'

'সিনেমা দেখে তারপর বাড়ি ফেরার সময় আমার কাছে যেতে?' মুখটা এমন করে ফেলেছিল শাখী, বংশী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

'কি করে করব?' শাখী অন্যদিকে চোখটা ঘুরিয়ে ফেলেছিল। 'দীঘা থেকে ঘুরে এসেই এ-পাড়ায় ছুটে এসেছ সিনেমা দেখতে—অথচ আমার সঙ্গে তোমার দেখা নেই।'

'হুঁ, বলছি তো, আজ যেতাম।'

'থাক, এখন সিনেমা দেখে দরকার নেই।' রাস্তার ওপর শাখী বংশীকে ধমক লাগাল, 'তার চেয়ে ঢের বেশি দরকারী কথা আছে। ঘরে চল।'

'তাই চল।' সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বংশী শাখীর পিছনে পিছনে চলল। আহা, কত অভিনয় জান তুমি মেয়ে! বংশী মনে মনে বলল. সারাদিন তো নিজের মতলব নিয়ে পাখিটি হয়ে ফুর ফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছ, এখন একেবারে সামনে পড়ে যেতেই এমন ভাব দেখাচ্ছ, কত যেন আমার জন্য তোমার দুশ্চিন্তা, কত যেন বিরহ তোমার ওই সুন্দর বুকটার ভিতর!

ঘাড় ফিরিয়ে শাখী বলছিল, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতা শহরে তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছ—নিশ্চয় আর কোন মেয়ের খপ্পরে পড়েছ!'

বংশী মনে মনে বলল, আমি কোন মেয়ের খপ্পরে পড়িনি, তুমি একটা বড়মানুষ লম্পটের খপ্পরে পড়েছ, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি লোকটাব বৌ আছে মেয়ে আছে। ওদের লখ্‌নৌ পাঠিয়ে দিয়ে বদমাসটা এখানে তোমার সঙ্গে পীরিত করছে, বা তোমার সঙ্গে পীরিত করার জন্য বৌ-মেয়েকে সরিয়ে দিয়েছে।

'কথা বলছ না কেন?' শাখী এবার ঘাড় ফেরাল।

'কি করব, তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর।' বংশী শুকনো একটু হাসল।

'তা হলে সত্যি তুমি দীঘা গিয়েছিলে বলছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' বংশী করুণ গলায় বলল। শাখীর মনটা একটু নরম হল।

'তা হলেও ফিরে এসে সিনেমা দেখার আগেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত ছিল।'

বংশী চুপ করে হাঁটতে লাগল। এখন দুজনে পাশাপাশি হয়ে হাঁটছিল।

'তুমি জান, কেমন একটা জরুরী কথার উত্তর তোমার কাছ থেকে জানব বলে আমি ঘরে বসে দিন গুনছি!'

হায় রে অভিনয়! মানুষ কত অভিনয় করতে পারে! চিন্তা করে বংশী মনে মনে হাসল। কিছু বলল না।

'কথাটা ভেবে দেখেছিলে?'

'হুঁ!' বংশী ফিক করে হাসল। তুমি অভিনয় করতে পার, আমিও কম পারি কি মেয়ে? মনে মনে বলল সে।

বড়রাস্তা শেষ করে দুজনে উমাশঙ্কর কবিরাজ লেনের মধ্যে ঢুকল।

'এখন সবটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।' শাথী আবার বলল, 'যা বলেছিলাম, অর্থাৎ যে-কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি, যদি রাজী হও তবে তোমার আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'

অভিনয়, স্রেফ নাটক, শাথীর হাবভাব দেখে-শুনে বংশীর যেমন হাসি পাচ্ছিল, ভিতরে ভিতরে সে রেগে যাচ্ছিল তার চেয়ে কিন্তু অনেক বেশি।

গলি শেষ করে দুপদাপ করে দুজনে প্রকাশ চাটুজ্যের বড় ঘরটা বাঁয়ে রেখে ছোট ঘরটায় এসে ঢুকল।

হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বংশী টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলল।

আঁচল দিয়ে শাথী কপালের ঘাম মুছল। উত্তেজনায় এবং বংশীকে নিয়ে দ্রুত হাঁটার দরুন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

'বল, তুমি রাজী আছ কিনা?'

'আগে এককাপ চা খাওয়াও দিকিনি।'

'চা তো খাবেই।' শাথী হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। একটা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আশা হতাশা আনন্দ বিষাদ অনেক কিছু তার মনের ওপর কাজ করছিল। এক সেকেণ্ড তার মুখটা দেখে বংশী বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, রাজী আছি।' অল্প হাসল সে, 'রাজী না হওয়ার তো কোন কারণ নেই—তুমি ছাড়া আমার আছে কে—'

'থাকবেই বা না কেন? তোমার মা আছে, বুড়ো বাপ আছে, ছোট ছোট ক'টি ভাইবোন—সবই আছে—ওদের ছেড়ে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—তোমার জন্য সবাইকেই ছেড়ে যেতে আমি রাজী আছি।'

'তা হলে তুমি মন ঠিক করে ফেলেছ?' চোখের তারা সূক্ষ্ম করে তাকাল শাখী।

'নিশ্চয়!' মুখে বলল বংশী। মনে মনে বলল, এই অভিনয় যে কতক্ষণ চলবে ভেবে পাচ্ছি না! 'কিন্তু কোথাও যাব যে', এবার সে হাসল, 'গিয়ে খাব কী, কাজকর্ম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে—তোমার একটা মুখ, আমার একটা মুখ!'

'বলছি তো, এসব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও—আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। বোসো, চা নিয়ে আসছি।'

সব ব্যবস্থা মেয়ে করে ফেলেছে! ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বংশী নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল। তবে কি সত্যি শাখী এখান থেকে তাকে নিয়ে কোথাও সরে যেতে উঠে-পড়ে লেগেছে! নিছক একটা কথার কথা না! তবে যে লার্কী সেদিন এতসব বলছিল, এ-পাড়ায় কোন্ বড়মানুষের সঙ্গে শাখীর রীতিমত ঢলাঢলি চলছে! কথাটা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? বংশী ঘামতে লাগল।

শাখী চা করে নিয়ে এল। উত্তেজনার ভাবটা কমে গেছে। মুখটা এখন অনেকটা হাসিখুশি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বংশী বলল, 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, যদি কোথাও আমাদের পালিয়ে যেতে হয়, তবে কিছু পুঁজির দরকার। অন্তত দু-চারশো টাকা হাতে না থাকলে সাংঘাতিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে দুজনকে।'

'দু-চারশো!' শাখীর চোখ চকচক করে উঠল, 'কত টাকা

আমি যোগাড় করেছি, চা খেয়ে একবার কোণের দিকের ওই স্যুট-কেসটা খুলে দেখতে পার।' শাখী আঙুল দিয়ে দেখাল। বংশী তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ধুলো মাকড়সার জালের মধ্যে ফেলে রাখা শাখীর ভাঙা ফাইবারের স্যুটকেসটা দেখল। তারপর এদিকে চোখ ফিরিয়ে হাসল।

'কত টাকা শুনি? কোথা থেকে যোগাড় করলে?' বংশীর চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছিল।

'যেখান থেকেই যোগাড় করি, এখনি তোমাকে বলছি না। হুঁ, বলতে পার কত টাকা—আমি মুখে বললে সেটা বিশ্বাস করবে কি, বরং চা-টা চেয়ে নিয়ে তুমি উঠে গিয়ে নিজের হাতে গুনে ছাখো।'

চা শেষ করা হল না। যেমন করে শাখী বলছিল! কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে প্রচণ্ড কৌতূহল ও উত্তেজনা নিয়ে বংশী তখনি স্যুটকেসটার কাছে ছুটে গেল। ডালাটা তুলল। তারপর শাখীর ছেঁড়া পুরনো সায়া-শাড়ির স্তূপের মধ্যে ডানহাতটা ঢুকিয়ে দিল। পিছন থেকে বেতের মোড়ায় বসে শাখী দেখছিল। দেখছিল আর টিপে টিপে হাসছিল। ওদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বংশী বাক্সটার ওপর ঝুঁকে আছে।

'কি হল, গুনলে?'

'গুনছি।' চাপা গমগমে গলায় বংশী উত্তর করল।

'গুনে শেষ কর।' শাখীর চোখে-মুখে আনন্দ যেন ধরছিল না, মোড়ায় বসে থেকে আদুরে গলায় বলল, 'এখনি আমি তোমাকে বলছি না কার কাছ থেকে টাকাটা যোগাড় করেছি, রাগী মানুষ তুমি, কী করতে কী করে বসো কে জানে বাপু! এখান থেকে সরে যাই, তারপর সব বলব।'

'সব আমি জেনে গেছি সোনা, সব আমার জানা হয়ে গেছে!' বংশী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে শাখী ভয় পেল, কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল।

'কেন, তুমি কি টাকাটা পাওনি—' আর্তনাদের মতন সুর করে শাখী চেঁচিয়ে উঠল। 'খামটা পেয়েছ তো, খামের ভেতর ভাঁজ-করা কুড়িটা একশো টাকার নোট?'

বিকৃত চেহারা করে বংশী হাসল। তার ডানহাতটা শার্টের নিচে লুকোনো। 'আর কত অভিনয় করবে মেয়ে, কত কাল আর ছলা-কলা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখবে আমায় বলতে পার?' সামনের দিকে গলাটা ঝুঁকিয়ে দিল বংশী।

'তুমি এদিকে সরে এসো তো—' রাগে অপমানে শাখী রীতিমত কাঁপছিল। 'টাকা আছে কি নেই আমি দেখছি, তোমার হাতে ওটা কি শুনি? জামার নিচে হাতটা এভাবে লুকিয়ে রেখেছ কেন বলতে পার?'

'আর বলাবলির কিছু নেই শাখী, সব বলাবলি আমি এখনি শেষ করে দিচ্ছি!' শার্টের তলা থেকে গুলী-ভরতি দু'ঘড়া রিভলবারটা বার করে বংশী শব্দ করে হেসে উঠল। ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল শাখী। কিন্তু তার আগেই ক্রুম-ড্রাম শব্দে ঘর-বাড়ি কেঁপে উঠল। চৌকাঠের কাছে শাখীর দেহটা লুটিয়ে পড়ল। রক্তে রক্তে ঘরের মেঝে দেওয়াল লাল হয়ে গেল।

কাঠ-কয়লার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জোনাকী ও পরেশ একবার উঁকি দিয়ে দেখল শুধু। আর এগোল না, একটা কথাও বলল না। কেন না শলা-পরামর্শ করে তারা ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে, সন্ধ্যার ট্রেনে দুজন পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাশ দু'হাজার হাতে এসে গেছে, আর ভাবনা নেই!

ওদিকে দুপুরের ঝিমোনি কাটিয়ে বিকেলের চমৎকার হলদে রোদ মাঠে-ময়দানে ছড়িয়ে পড়ছিল। গাছের ছায়ায় বসে প্রকাশ চাটুজ্যে চার পয়সার চিনেবাদাম কিনে টুকটাক্ মুখে ফেলছিলেন। তাঁর যে

কোন চিন্তা নেই। ডানাকাটা পরীর মতন তিন মেয়ে ঘরে। রাজার মতন সুখী তিনি। তাই যখন-তখন, যেখানে খুশি বসে পড়ে আরামের হাঁই তোলেন। চিনেবাদাম খান বা হাঁটেন। না, প্রকাশ চাটুজ্যে জানলেন না, এই পার্ক থেকে খুব দূরে হবে না, একশো গজের মধ্যে তাঁর আর একটি পরীর মতন রূপসী কন্যা যার নাম লাকী, একটা অল্প-বয়সের ছোঁড়ার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নিশ্চিন্তে হাঁটছিল, পিছন থেকে একটা লোক হঠাৎ তাড়া করতে ছেলেটির হাত ছেড়ে দিয়ে লাকী ট্রাম-লাইন পার হতে গেল। কিন্তু কিছু একটার মধ্যে শাড়ির পাড়টা আটকে গিয়ে লাকী নিচে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাম এসে লাকীর শরীটাকে থেঁতলে মুচড়ে ভেঙে দুমড়ে দলা করে প্রায় দশ গজ দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ঘটাং করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন ভীষণ হৈ-হল্লা! অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রামের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরকে টেনে নামিয়ে মারতে চাইছে। আগুন ধরিয়ে দিতে চাইছে ট্রামে। পাগলের মতন চেহারা, লম্বা চুল মাথায়, মুখে দাড়ির জঙ্গল, একটা লোক খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে। উঁহু, প্রকাশবাবু দেখলেন না। দেখলে চিনতেন। লোকটার নাম সুখেন। নতুনবাজারে তার গুড়ের দোকান আছে।